এবং বলিয়াছেন যে, তিনজন লোক হইলেই জামায়াত হয়। হুযূর (সা) বলেন ঃ সফরে একজনকে নিজেদের নেতা ও সরদার বানাইয়া লওয়া মুসাফিরদের উচিত। কারণ, সফরে (সহযাত্রীদের মধ্যে) মতানৈক্য হইয়া থাকে এবং যে কার্য একজনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে তাহা বিনষ্ট হইবে। বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা বিধান দুই খোদার উপর ন্যস্ত থাকিলে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হইয়া যাইত। আর এমন ব্যক্তিকে নেতা বানাইবে যে সৎস্বভাবে সর্বপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং বহুবার ভ্রমণ করিয়াছে।

তৃতীয় নিয়ম ঃ বন্ধু-বান্ধব ও পরিবার-পরিজনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে এবং প্রত্যেকের জন্য নিম্নরূপ দু'আ করিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইরূপ দু'আ করিতেন।

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ-

তোমার ধর্ম, তোমার আমানত এবং তোমার কার্যাবলীর পরিণাম আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করিলাম।

কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে সফরে যাত্রা করিলে তিনি এইরূপ দু'আ করিতেন ঃ

زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا تَوَجَّهْتَ-

আল্লাহ্ পরহিযগারীকে তোমার পথের সম্বল করুন এবং তোমার গুনাহ্ মাফ করুন ও তুমি যেদিকে মুখ ফিরাও সেদিকেই তোমার মঙ্গল করুন।

ভ্রমণে যাত্রাকারীকে এইরূপ দু'আ করা গৃহে অবস্থানকারীর উপর সুন্নত এবং বিদায়কালে সকলকে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করা উচিত।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) একদা গরীব-মিসকীনদের মধ্যে ধন বিতরণ করিতেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাহার শিশু ছেলেকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ছেলেটিকে দেখিয়া হযরত উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! তোমার আকৃতির সহিত এই ছেলেটির আকৃতির যতটুকু মিল দেখা যাইতেছে, পিতার সহিত পুত্রের আকৃতির এতটুকু মিল আমি আর কখনও দেখি নাই। সেই লোকটি নিবেদন করিল ঃ ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! এই বালকটির কাহিনী বিচিত্র ও অভিনব। ইহা আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি। এই শিশুটি মাতৃগর্ভে থাকাকালে আমি ভ্রমণে যাইতেছিলাম, এমন সময় স্ত্রী আমাকে বলিল, আমাকে এই অবস্থায় রাখিয়া তুমি ভ্রমণে যাইতেছ? উত্তরে আমি বলিলাম ঃ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ مَا فِىْ بَطْنِكَ

তোমার গর্ভস্থিত সন্তানকে আমি আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করিলাম।

আমি সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। এক রাত্রে আমি বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলাম। দূরে আগুনের মত দেখিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা কি? সঙ্গীরা বলিল ঃ সেখানে তোমার স্ত্রীর কবর। প্রতি রাত্রেই আমরা এইরূপ দেখিয়া থাকি। আমি উত্তর করিলাম ঃ ইহা কিরূপে হইতে পারে? সেও নামায পড়িত, রোযা করিত। যাহাই হউক, আমি সেখানে গেলাম এবং ভিতরে কি আছে, দেখিবার জন্য কবর খুড়লাম। আমি দেখিতে পাইলাম, একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং এই ছেলেটি ইহা লইয়া খেলা করিতেছে। তখন আমি এক বাণী শুনিতে পাইলাম-ওহে! এই ছেলেটিকে তুমি আমার নিকট সোপর্দ করিয়াছিলে, এখন আমি তাহাকে তোমার নিকট সোপর্দ দিয়া দিলাম! তুমি তখন তাহার মাতাকেও আমার নিকট সোপর্দ করিলে আমি তাহাকেও তোমার নিকট দিয়া দিতাম।

চতুর্থ নিয়ম ঃ দুই প্রকার নামায পড়িবে। ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্বে 'ইস্তিখারা' নামায পড়িবে। এই নামাযের নিয়ম ও দু'আ সর্বজন বিদিত। তৎপর গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় দ্বিতীয় প্রকার নামায পড়িবে। ইহা চারি রাকা'আত। ইহার কারণ এই যে, হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া নিবেদন করিল ঃ আমি ভ্রমণে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। আমি একখানি 'ওসীয়ত নামা' লিখিয়াছি। পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার মধ্যে কাহাকে প্রদান করিব? হুযূর (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ ভ্রমণে যাওয়ার প্রাক্কালে যে চারি রাকা'আত নামায পড়া হয় তদপেক্ষা প্রিয়তর ইহার কোন স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি আল্লাহ্র নিকট আর কিছুই হইতে পারে না। যখন সফরের সামানপত্র বাঁধিয়া ফেলিবে তখন এই নামাযে (প্রত্যেক রাকা'আতে) সূরা ফাতিহা ও সূরা কুলহুওয়াল্লাহু আহাদ পড়িবে এবং এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتَقَرَّبُ بِهِنَّ اِلَيْكَ فَاخْلُفْنِىْ بِهِنَّ فِىْ اَهْلِىْ وَمَالِىْ-

ইয়া আল্লাহ্! এই নামায দ্বারা আমি তোমার নৈকট্য প্রার্থনা করিতেছি। সুতরাং উহাকে আমার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পত্তির মধ্যে আমার প্রতিনিধি কর।

এই নামায তাহার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পত্তিতে তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া থাকে এবং সে গৃহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত উহা তাহার গৃহের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহারা দেয়।

পঞ্চম নিয়ম ঃ ভ্রমণে যাত্রার সময় গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া এই দু'আ পরিবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ-

আমি আল্লাহ্‌র নামে এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যে আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ্‌র উপরই আমি নির্ভর করিতেছি। মন্দকার্য হইতে ফিরিবার ক্ষমতা ও সৎকার্যের শক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কাহারও নাই। ইয়া রব্ব! তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি আমি যেন পথভ্রষ্ট না হই কিংবা কাহাকেও যেন পথভ্রষ্ট না করি, আমি যেন কাহারও প্রতি অত্যাচার না করি কিংবা আমিও যেন অত্যাচারিত না হই আমি যেন অপরকে জ্ঞানহারা না করি কিংবা আমিও যেন কাহারও কর্তৃক জ্ঞানহারা না হই।

আর যানবাহনে আরোহণকালে এই দু'আ পড়িবে ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ-

সেই আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি যিনি এই বাহনকে আমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন এবং ইতিপূর্বে ইহার উপর আমরা ক্ষমতাবান ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করিব।

ষষ্ঠ নিয়ম ঃ বৃহস্পতিবার সকালের ভ্রমণে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সফরে বাহির হইবার ইচ্ছা করিলে কিংবা দু'আ করিতে হইলে উহা সকালে করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لاُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا يَوْمَ السَّبْتِ-

ইয়া আল্লাহ্ ! আমার উম্মতগণের জন্য শনিবারের প্রাতঃকালে বরকত দান কর। হুযূর (স) এই দু'আও করিয়াছেন ।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لاُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا يَوْمًا الْخَمِيْسِ-

ইয়া আল্লাহ্! আমার উম্মতের জন্য বৃহস্পতিবারের প্রতূষ্যে বরকত দান কর। অতএব শনিবার ও বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল মঙ্গলময়।

সপ্তম নিয়ম ঃ বাহন পশুর উপর অল্প বোঝা চাপাইবে। ইহার পিঠের উপর দাঁড়াইবে না ও শয়ন করিবে না। ইহার মুখের উপর আঘাত করিবে না। প্রাতে ও সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য পশুর পৃষ্ঠ হইতে নামিবে। ইহাতে নিজের পায়ের জড়তা দূর

হইবে এবং পশুর মালিকের মনও সন্তুষ্ট হইবে। পূর্বকালের কোন কোন বুযর্গ এইরূপ শর্তে পশু ভাড়া করিতেন যে, পথিমধ্যে কোথাও পশু পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিবেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহারা অবতরণ করিতেন যেন এই অবতরণ পশুর প্রতি বদান্যতা বলিয়া গণ্য হয়। পশুকে বিনা কারণে প্রহার করিলে অথবা ইহার উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাইলে কিয়ামতের দিন ইহা আরোহীর সহিত ঝগড়া করিবে।

হযরত আবু দারদা (রা)-র একটি উট মারা গেলে তিনি ইহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ হে উট ! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিও না। কারণ তুমি জান যে, তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি তোমার উপর বোঝা চাপাইয়াছি। পশুর উপর যত বোঝা চাপাইবে, পূর্বেই পশুর মালিককে তাহা জানাইয়া দিবে এবং শর্ত করিয়া লইবে। তাহা হইলে তাহার সন্তুষ্টি লাভ করিবে। আর চুক্তির অতিরিক্ত বোঝা ইহার উপর চাপাইবে না। হযরত ইব্‌ন মুবারক (র) উটের উপর আরোহী থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি আসিয়া অপর কাহারও নিকট দেওয়ার জন্য একটি চিঠি তাঁহার হস্তে দিতে চাহিলে তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই এবং বলিলেন ঃ ভাড়া করিবার সময় পশু মালিকের নিকট এই চিঠির কথা বলি নাই। যদিও চিঠির মত অতি সামান্য ওজনের দ্রব্য সঙ্গে লওয়াতে শরীয়তের ব্যবস্থা অনুযায়ী ক্ষতির কোন কিছুই নাই, তথাপি তিনি শরীয়তের বিধানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, এই কার্য পরহিযগারী সম্মত নহে।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে , রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফরে যাওয়ার সময় 'চিরুনী, আয়না, মিসওয়াক, সুর্মাদানী, এবং মুদরী (যদদ্বারা মাথার চুল সোজা করা হয়) নিজের সঙ্গে লইতেন। অপর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, তিনি সফরে নরুন ও শিশিও সঙ্গে লইতেন। সূফীগণ এতদসঙ্গে বালতি এবং রশিও সংযোগ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বকালীন বুযর্গগণের বালতী ও রশি লওয়ার অভ্যাস ছিল না কারণ, তাঁহারা যেখানেই গমন করিতেন পানি না পাইলে তায়াম্মুম করিতেন এবং মলমূত্র ত্যাগের পর শৌচকার্যের পরিবর্তে প্রস্তর খণ্ড দ্বারা অপবিত্রতা দূর করিতেন। আর যে পানিকে পাক বলিয়া মনে করিতেন তদদ্বারা ওযূ-গোসলের কার্য সমাধা করিতেন। প্রাচীনকালের বুযর্গগণের বালতি ও রশি সঙ্গে লওয়ার অভ্যাস না থাকিলেও একালে উহা লওয়াই উত্তম। কারণ, একালের সফর এমন নহে যে, পবিত্রতা রক্ষার জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা যাইবে না। আর সর্তকতা অবলম্বন করাই উত্তম। পূর্বকালের বযর্গগণ জিহাদ ও অন্যান্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য উপলক্ষে সফর করিতেন এবং এই জন্য অতিরিক্ত সতকর্তা অবলম্বনে লিপ্ত হইতেন না।

অষ্টম নিয়ম ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফর হইতে প্রত্যাবর্তন কালে মদীনা শরীফের প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ামাত্র এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا وَقْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا–

ইয়া আল্লাহ্! ইহাকে আমাদের জন্য শান্তিময় এবং উৎকৃষ্ট জীবিকাযুক্ত কর।

তৎপর কোন একজনকে প্রত্যাবর্তন-সংবাদ প্রদানের জন্য শহরে পাঠাইতেন এবং খবর না দিয়া হঠাৎ স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিতে সঙ্গীদিগকে নিষেধ করিতেন। একবার এই নির্দেশ অমান্য করিয়া দুই ব্যক্তি তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ গৃহে অপ্রিয় কায দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সর্বপ্রথমে মসজিদে প্রবেশ করত ঃ দুই রাক'আত নামায পড়িতেন এবং গৃহে প্রবেশকালে এই দু'আ পড়িতেন ঃ

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا اَوْبًا لاَّ يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا–

আমার প্রভুর নিকট তওবা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলাম। এমন তওবা করিতেছি যাহাতে আমাদের পাপের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট না থাকে।

প্রত্যাবর্তনের সময় গৃহবাসীদের জন্য উপঢৌকনাদি লইয়া আসা সুন্নতে মুআক্কাদা। হাদীস শরীফে আছে, কোন উপঢৌকন আনিবার মত সামর্থ্য না থাকিলে অন্তত একটি প্রস্তর খণ্ড বোচকার মধ্যে করিয়া আনিবে। এই সুন্নত পালনের প্রতি তাগিদ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই হুযূর (সা) এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন।

উপরে সফরের বাহ্য নিয়ম বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত আর কতকগুলি আভ্যন্তরীণ নিয়ম আছে যাহা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য পালনীয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভ্রমণের নিয়মাবলী ঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে পর্যন্ত বুঝিতে না পারেন যে, সফরেই তাঁহাদের ধর্মীয় উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি নিহিত রহিয়াছে, সে পর্যন্ত তাঁহারা সফরে বাহির হন না এবং পথিমধ্যে নিজেদের অন্তরে ধর্ম সম্বন্ধে কিছুমাত্র ক্ষতি অনুভব করিলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ফিরিয়া আসেন। আর সফরে বাহির হওয়ার সময় এইরূপ নিয়্যত করেন, যে নগরেই গমন করি না কেন, তথাকার, নেক্কার ও বুযর্গগণের কবর যিয়ারত করিব, পীরের অনুসন্ধান করিব এবং সকলের নিকট হইতেই উপকার লাভ করিব। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে পীর অনুসন্ধান করেন না যে, সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, 'অমুক পীরের দর্শন লাভ করিয়াছি" বলিয়া লোকের সম্মুখে গল্প বলিবেন; বরং কোন কামিল পীর পাইলে তাঁহার অনুসরণ করিবেন, এই জন্যই তাঁহারা পীরের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা দশদিনের অধিক কোন শহরে অবস্থান করেন না। তবে পীরের দরবারে অবস্থানের প্রয়োজন হইলে দশদিনের অতিরিক্ত অবস্থান করেন। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে তথায় তিনদিনের অধিক থাকা উচিত নহে। কারণ, মেহমানদারীর সীমা এ পর্যন্তই। কিন্তু গৃহস্বামী আরও অধিককাল থাকিবার জন্য আন্তরিকতার সহিত আবদার

করিলে তিনদিনের অধিককালও অবস্থান করা যাইতে পারে। কোন বুযর্গের সহিত শুধু সাক্ষাতলাভের উদ্দেশ্যে গমন করিলে একদিন ও একরাত্রির অধিক তথায় অবস্থান করা উচিত নহে।

কাহারও সহিত সাক্ষাতের জন্য গমন করিলে তাঁহার দরজায় খট্ খট্ করিবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ গৃহ হইতে বাহির না হয় ও তাঁহার সহিত সাক্ষাত না হয় ততক্ষণ ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিবে এবং অপর কোন কাজ আরম্ভ করিবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে কিছু বলিবে না। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই বলিবে। তুমি নিজে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলে তাঁহার অনুমতি লইয়া জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাঁহার বস্তিতে যাইয়া কোন আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইবে না। কারণ, ইহাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের বিশুদ্ধ সংকল্প বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যাতায়াতের পথে সর্বদা আল্লাহ্র যিকর ও তস্বীহে মগ্ন থাকিবে এবং কুরআন শরীফ নিম্নস্বরে পড়িতে থাকিবে যেন অপর কেহ শুনিতে না পায়। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তসবীহ বন্ধ করিয়া তাহার জওয়াব দিবে। সফরের যে উদ্দেশ্য, উহা গৃহেই সফল হইলে সফরে বাহির হইবে না। কারণ ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলার দানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ভ্রমণে যাত্রার পুর্বে শিক্ষণীয় বিষয় ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সকল বিষয় মুসাফিরের জন্য সহজ করিয়া দিয়াছেন (রুখসত) এবং অনুমতি (ইজাযত) প্রদান করিয়াছেন ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্বে তৎসমূদয়ের জ্ঞানলাভ করা মুসাফিরের উপর ওয়াজিব। সহজ বিধানানুসারে কার্য করিবার অভিপ্রায় না থাকিলেও ভ্রমণে এমন কোন আবশ্যকতা দেখা দেওয়া অসম্ভব নহে যাহার কারণে, সহজ বিধান অনুযায়ী কার্য সম্পন্ন করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িতে পারে।

ভ্রমণকালে কিবলা নির্ণয়ের পদ্ধতি ও নামাযের ওয়াক্ত সম্বন্ধে জ্ঞান ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্বেই অর্জন করা কর্তব্য। ভ্রমণকালে উযূ সম্বন্ধে দুইটি সহজ বিধান আছে মোজার উপর মাসেহ করা ও উযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা। ফরয নামাযেরও দুইটি সহজ বিধান আছে, নামাযে কসর করা এবং দুই ওয়াক্তের ফরয নামায একত্রে পড়া। সুন্নত নামাযে দুইটি সহজ বিধান আছে, যানবাহনের উপর অবস্থিত থাকিয়া পড়া এবং পদব্রজে চলিতে চলিতে পড়া। রোযা সম্বন্ধে সহজ বিধান একটি । সফরকালে রোযা না রাখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর কাযা করা। সফরকালের ইবাদতের জন্য এই সাতটি সহজ বিধান রহিয়াছে।

প্রথম সহজ বিধান ঃ চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করা। মুসাফির পূর্ণ পবিত্রতার সহিত মোজা পরিধান করিয়াছে, এমতাবস্থায় উযূ ভঙ্গ হইলে প্রথমবার উযূ

ভঙ্গ হইবার সময় হইতে তিনদিন তিনরাত্রি পর্যন্ত যতবার উযূ ভঙ্গ হইবে , প্রত্যেক উযূর সময় মোজা হইতে পা না খুলিয়া মোজার উপর মাসেহ করিলেই চলিবে, পা ধুইতে হইবে না। মুকীম ব্যক্তি একদিন একরাত্রি পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করিতে পারে।

মোজার উপর মাসেহের পাঁচটি শর্ত ঃ ১. সম্পূর্ণরূপে উযূ করিয়া মোজা পরিধান করিবে। ডান পা ধুইয়া বাম পা ধুইবার পূর্বে ডান পায়ে মোজা পরিলে হয়রত ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে মোজার উপর মাসেহ করা সঙ্গত নহে। তবে বাম পা ধৌত করিয়া মোজা পরিবার পূর্বে ডান পায়ের মোজা খুলিয়া পুনরায় একসঙ্গে উভয় পায়ে মোজা পরিলে এই মোজার উপর মাসেহ করা চলিবে।

২. মোজা এমন শক্ত হওয়া আবশ্যক যাহা পরিধান করিয়া কিছু দূর পথ চলা যায়। সুতরাং চামড়ার মোজা না হইলে মোজার উপর মাসেহ দুরস্ত নহে।

৩. পায়ের টাখনুর উপর পর্যন্ত যতটুকু ওযূর মধ্যে ধৌত করা ফরয, সেই পর্যন্ত মোজার কোন স্থানে ছেড়াফাঁটা না হওয়া এবং সেই পর্যন্ত স্থান মোজা দ্বারা আবৃত থাকা। এই পরিমাণ স্থানে মোজার ছিদ্র থাকার কারণে পায়ের কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হইলে হযরত ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে এইরূপ মোজার উপর মাসেহ করা সঙ্গত নহে। কিন্তু হযরত ইমাম মালিক (র)-এর মতে মোজা ছেঁড়া হইলেও ইহা পরিয়া যদি হাঁটা যাইতে পারে, তবে উহার উপর মাসেহ করা দুরস্ত আছে এবং পূর্বে হযরত ইমাম শাফিঈ (র)-র এই মতই পোষণ করিতেন। আমাদের মতে হযরত ইমাম মালিক (র) -এর মতই উৎকৃষ্টতর। কারণ, পথ চলিতে চলিতে অনেক সময় মোজা ফাটিয়া যায় এবং প্রত্যেকবার উহা সেলাই করিয়া লওয়া সম্ভব হয় না।[ক]

৪. মোজা পরিয়া উহার উপর মাসেহ করিলে মোজা খুলিবে না এবং খুলিয়া ফেলিলে আবার নূতনভাবে উযূ করিয়া পুনরায় মোজা পরাই উত্তম। মোজার উপর মাসেহ করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোজা খুলিলে শুধু দুই পা ধুইয়া লইলেই চলিবে।

৫. পায়ের গোছার উপর মাসেহ করিবে না; বরং পায়ের সম্মুখস্থ ভাগে মাসেহ করিবে। পায়ের পাতার উপরিভাগ মাসেহ করাই উত্তম। এক আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করিলেই যথেষ্ট।[খ] কিন্তু তিন আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করাই উত্তম। একবারের অধিক মাসেহ করিবে না। সফরে বাহির হইবার পূর্বে মোজার উপর মাসেহ করিয়া থাকিলে একদিন একরাত্রির অধিককাল পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করিবে না।[গ]

ক. হানাফী মাযহাবমতে মোজা তিন আঙ্গুল পরিমাণ ফাটা হইলে ইহার উপর মাসেহ করা দুরস্ত নহে।

খ. মানাফী মাযহাবমতে তিন আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করা ফরয। এক বা দুই আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করা দুরস্ত নহে।

মোজা পরিধান করিবার সময় উহা উল্টাইয়া ঝাড়িয়া লইয়া পায়ে দেওয়া সুন্নত। কারণ, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) একখানা মোজা পরিধান করিতেই অপর মোজাখানি একটি কাক আসিয়া ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল এবং শূন্যে উঠিয়া মোজাখানি ছাড়িয়া দেওয়ামাত্র উহা হইতে একটি সাপ বাহির হইয়া আসিল। তখন হুযূর (স) বলিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, তাহাকে বলিয়া দাও, মোজা ঝাড়িয়া না ফেলা পর্যন্ত যেন কেহ উহা পরিধান না করে।

দ্বিতীয় সহজ বিধান ঃ তায়াম্মুম। এই গ্রন্থের ইবাদত খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে উযূর বিবরণ প্রসঙ্গে ইহার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় পুনরুল্লেখ করা হইল না।

তৃতীয় সহজ বিধান ঃ সফরে চারি রাক'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযকে কসর (সংক্ষেপ) করিয়া দুই রাকা'আত পড়া। কিন্তু ইহার চারিটি শর্ত আছে।

প্রথম শর্ত ঃ নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়া। কাযা পড়িবে কসর পড়িবে না (হানাফী মাযহাবমতে সফরকালীন কসর নামাযের কাযা গৃহে ফিরিয়া আদায় করিলেও কসরই পড়িতে হইবে। অনুরূপভাবে গৃহে থাকাকালীন চারি রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযের কাযা সফরে যাইয়া আদায় করিলেও চারি রাকা'আতই পড়িতে হইবে)।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ কসর পড়ার নিয়্যত করিবে। পূরা নামাযের নিয়্যত করিলে অথবা পূরা নামাযের নিয়্যত করা হইল না কসরের নিয়্যত করাই হইল, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে পূরা নামায আদায় করিতে হইবে।

তৃতীয় শর্ত ঃ যে ব্যক্তি পূরা নামায পড়িবে তাহার ইকতিদা করিবে না (হানাফী মাযহাবমতে মুসাফির মুকীমের ইকতিদা করিতে পারে এবং মুকীম ব্যক্তি ইমাম হইলে মুসাফির মুকতাদিগকেও পূরা নামাযই পড়িতে হইবে। কিন্তু ইকতিদা করিলে অবশ্যই পূরা নামায পড়িতে হইবে, এমনকি যদি এই ধারণা হয় যে, ইমাম মুকীম ও তিনি নামায পড়াইবেন তবে মুকতাদি সন্দেহে রহিল! এমতাবস্থায় তাহাকে পুরা নামাযই পড়িতে হইবে। কারণ, মুসাফির চিনা দুষ্কর। কিন্তু মুকীম ইমামকে মুসাফির বলিয়া সন্দেহ করত ঃ এই ধারণা করিলে যে, তিনি কসর পড়িবেন এবং পরে তিনি কসর না পড়েন, তবে এইরূপ সন্দেহকারী মুসাফিরের জন্য কসর পড়া দুরস্ত আছে। কেননা, নিয়্যত গুপ্ত বিষয় এবং ইহা অবগত হওয়া শর্তরূপে নির্ধারিত হইতে পারে না।

গ. হানাফী মাযহাবমতে, কোন ব্যক্তি যদি মুকীম অবস্থায় মাসেহ আরম্ভ করিয়া থাকে এবং একরাত ও একদিন অতিবাহিত না হইতেই সে মুসাফির হইয়া যায়, তবে সে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মাসেহ করিবে। কিন্তু যদি মুসাফির হইবার পূর্বেই একরাত্র একদিন অতিবাহিত হইয়া যায় তবে তাহার মুদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া পুনরায় পা ধৌত করিয়া মোজা পরিবে।

চতুর্থ শর্ত ঃ দূরের পথে এবং শরীয়ত অনুসারে জায়েয সফর হওয়া আবশ্যক। সুতরাং পলাতক দাস-দাসীর সফর, ডাকাতি করিবার জন্য সফর, হারাম আমদানির জন্য সফর এবং মাতাপিতার বিনা অনুমতিতে সফর করা হারাম। এই সকল হারাম সফরে উপরিউক্ত সহজ বিধানসমূহ ভোগ দুরস্ত নহে। অনুরূপভাবে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধের ভয়ে মহাজন হইতে আত্ম-গোপনের উদ্দেশ্যে সফর করাও হারাম। মোটকথা, যে কার্য হারাম, তজ্জন্য সফর করাও হারাম।

ষোল ফরসখের পথকে দূরের পথ বলা হয়। তদপেক্ষা কম পথে কসর দুরস্ত নহে। প্রতি বার হাযার কদমে এক ফরসখ হয় (হানাফী মাযহাবমতে ন্যূনপক্ষে ৪৮ মাইলের পথ হইল কসর দুরস্ত)। শহরের জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলে স্বীয় এলাকা অতিক্রম করিলেই সফর আরম্ভ হয়। জনবসতির পরে উহার চারিপার্শ্বে যে, স্বীয় এলাকা অতিক্রম করিলেই সফর আরম্ভ হয়। সমস্ত শস্যক্ষেত্র কিংবা বাগান থাকে, তাহা বস্তির মধ্যে গন্য নহে। সফরকালে কোন বস্তিতে প্রবেশ ও বহির্গত হওয়ার দিন ব্যতীত ৩ দিন (হানাফী মতে ১৫ দিন) বা ততোধিক দিন অবস্থানের নিয়্যত করিলে সফর শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তদপেক্ষা কম সময় অবস্থানের নিয়্যত করিয়া যদি কোন কার্য উপলক্ষে বিলম্ব হইয়া যায় এবং সেই কার্য কোন্ দিন সম্পন্ন হইবে ইহার নিশ্চয়তা না থাকে, প্রত্যেকদিনই আশা করা যায়- অদ্য সম্পন্ন হইবে এবং এইরূপ ৩ দিনের অধিককাল গত হইয়া যায়, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি মুসাফির বলিয়াই গণ্য হইবে এবং তাহাকে কসর পড়িতে হইবে। কারণ, সে নিয়্যত করিয়া সে স্থানে অবস্থান করে নাই এবং এতদিন অবস্থানের উচ্ছাও করে নাই।

চতুর্থ সহজ বিধান ঃ দুই ওয়াক্তের ফরয নামায একই সময়ে পড়িবার অনুমতি। দূরের পথে এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বৈধ সফরে জুহরের নামাযে বিলম্ব করিয়া আসরের নামাযের সহিত অথবা আসরের নামাযকে আগাইয়া আনিয়া জুহরের নামাযের সহিত পড়া দুরস্ত আছে (হানাফী মায্হাবমতে কেবল হজ্জের সফরেই ইহা দুরস্ত)। মাগরিব ও ইশার নামাযের জন্যও এই একই বিধান। আসর ও জুহরের নামায একত্রে পড়িতে হইলে প্রথমে জুহরের নামায পড়িয়া তৎপর আসরের নামায পড়িবে। সুন্নত নামাযগুলিও পড়িয়া লওয়া উত্তম যেন উহার ফযীলত হইতে বঞ্চিত হইতে না হয়। কেননা, উহা হইতে বঞ্চিত থাকিলে সফরের মঙ্গল লাভ হইবে না। প্রয়োজনবোধে ইচ্ছা করিলে সুন্নত নামায বাহনের উপর কিংবা চলিতে চলিতেও পড়া যায়। সুন্নত নামাযসমূহ জুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়িলে প্রথম জুহরের পূর্ববর্তী চারি রাকা'আত সুন্নত পড়িবে, তৎপর আসরের ফরযের পূর্ববর্তী চারি রাকা'আত সুন্নত পড়িবে। তৎপর আযান ও ইকামত দিয়া জুহরের ফরয নামায পড়িবে এবং তৎপর ইকামত বলিয়া আসরের নামাযের ফরয পড়িবে। তায়াম্মুম করিয়া

নামায পড়িয়া থাকিলে জুহরের ফরয নামায পড়িবার পর আবার নূতন করিয়া তায়াম্মুম করিবে। উভয় নামাযের মধ্যে তায়াম্মুম ও ইকামত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক সময় বিলম্ব করিবে না। অতঃপর জুহরের ফরযের পরবর্তী দুই রাক'আত সুন্নত এই আসরের ফরয নামাযের পরে পড়িবে। জুহরের নামাযকে বিলম্ব করিয়া আসরের নামাযের সহিত একত্রে পড়িলে এই নিয়মে পড়িতে হইবে। সফরকালে এই নিয়মে আসরের নামায পড়িয়া সূর্যাস্তের পূর্বে স্বীয় বস্তিতে প্রবেশ করিলেও আসরের নামায পুনরায় পড়িতে হইবে না। মাগরিব ও ইশার নামাযেরও এই একই বিধান। এক উক্তি অনুসারে ছোট সফরেও দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া যায়।

পঞ্চম সহজ বিধান ঃ কেবল সুন্নত নামায বাহন পশুর পৃষ্ঠের উপর বসিয়া আদায় করা দুরস্ত আছে এবং কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব নহে; বরং পশু যে দিকে মুখ করিয়া পথ চলে সে দিকেই কিবলা। কিন্তু যে দিকে কিবলা নহে, সেদিকে পশুকে ইচ্ছাপূর্বক ফিরাইলে নামায নষ্ট হইয়া যাইবে। ভুলক্রমে অন্যদিকে ফিরাইলে কিংবা চরিতে চরিতে পশু অন্যদিকে মুখ ফিরাইলে আরোহির নামাযের কোন ক্ষতি হইবে না। বাহনের উপর নামায পড়িবার সময় রুকু-সিকদা ইশারায় সমাধা করিবে। রুকুর জন্য পিঠ কম ঝুঁকাইবে এবং সিজদার জন্য তদপেক্ষা কিছু অধিক ঝুঁকাইবে। যতটুকু ঝুঁকিলে বাহনের পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাওয়ার আশংকা হয় ততটুকু ঝুকা আবশ্যক নহে। বাহন-পশুর পৃষ্ঠে শুইবার স্থান করিয়া লইয়া থাকিলে এবং তথায় বসিয়া নামায পড়িলে, রুকু-সিজদা পুরাপুরি আদায় করিবে।

ষষ্ঠ সহজ বিধান ঃ সুন্নত নামায পদব্রজে চলন্ত অবস্থায় পড়িবার অনুমতি। ইহার নিয়ম এই যে, প্রথম তকবীরের সময় কিবলামুখী হইবে (তৎপর গন্তব্য পথের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে পড়িতে পথ চলিবে)। হাঁটিয়া চলার সময় কিবলামুখী হইয়া নামায আরম্ভ করা তাহার পক্ষে কঠিন নহে। অপরপক্ষে নামায আরম্ভ করিবার সময় বাহন পশুকে বিকলামুখী করিয়া রাখা কঠিন। হাঁটা অবস্থায় নামায পড়িতে রুকু-সিজদা ইশারায় সমাধা করিবে এবং চলিতে চলিতে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়িবে। কিন্তু সতর্ক থাকিবে যেন পা অপবিত্র পদার্থের অপর পতিত না হয়। তবে চলিবার পথ অপবিত্রতাপূর্ণ হইলে সে পথ হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক অন্য কোন দুর্গম পথ অবলম্বন করা তাহার প্রতি ওয়াজিব নহে। প্রাণভয়ে শত্রু হইতে পলায়মান ব্যক্তি, রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত ব্যক্তি এবং বন্যার প্রখর স্রোত ও ব্যঘ্রাদি হিংস্রজন্তু হইতে পলায়মান ব্যক্তি হাঁটিয়া পথ চলিতে চলিতে কিংবা বাহনের উপর থাকিয়া ফরয নামাযও সেই নিয়মে পড়িতে পারে যাহা সুন্নত নামায সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার কাযা আদায় করা ওয়াজিব হইবে না।

সপ্তম সহজ বিধান ঃ সফরে রোযা না রাখার অনুমতি। মুসাফির রোযার নিয়্যত করিয়া থাকিলেও রোযা ভঙ্গ করিতে পারে। কিন্তু সুবহি সাদিকের পর সফরে বাহির হইলে সে দিনের রোযা ভঙ্গ করা দুরস্ত নহে। মুসাফির রোযা ভঙ্গ করিয়া কোন শহরে প্রবেশ করিলে সেই দিনে পানাহার করা তাহার জন্য দুরস্ত আছে। কিন্তু রোযা ভঙ্গ না করিয়া কোন শহরে প্রবেশ করিয়া থাকিলে সেই দিন রোযা ভঙ্গ করা দুরস্ত নহে। সফরে পূরা নামায পড়া অপেক্ষা কসর করা উত্তম; তাহাতে মতভেদের সন্দেহে পড়িতে হয় না। কারণ, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে মুসাফির অবস্থায় পূরা নামায পড়া দুরস্ত নহে। কিন্তু সফরে রোযা ভঙ্গ করা অপেক্ষা রোযা রাখাই উত্তম। ইহাতে রোযা কাযা আদায়ের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু সফরে ক্লান্তিবশতঃ রোযা রাখিবার ক্ষমতা না থাকিলে রোযা ভঙ্গ করাই উত্তম।

উল্লিখিত সাতটি সহজ বিধানের মধ্যে (১) কসর নামায পড়া, (২) রোযা ভঙ্গ করাও তিনদিন তিনরাত্রি মোজার উপর মাসেহ্ করা একমাত্র লম্বা সফরের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর (১) বাহন পশুর পিঠে ও পদব্রজে চলন্ত অবস্থায় সুন্নত নামায পড়া ; (২) জুমু'আর নামায না পড়া এবং (৩) পানির অভাবে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়া পরে পানি পাওয়া গেলেও যাহার কাযা আদায় করিতে হয় না, এই তিনটি ছোট সফরেও দুরস্ত আছে। কিন্তু দুই ওয়াক্তের ফরয নামায একত্রে পড়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে স্পষ্ট কথা এই সে, ছোট সফরে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়াই উচিত। প্রয়োজনমত সময়ে মাস'আলা জানিয়া লওয়ার মত আলিম সঙ্গে না থাকিলে সফরে বাহির হইবার পূর্বে প্রয়োজনীয় সকল মাস'আলা শিখিয়া লওয়া মুসাফিরের অবশ্য কর্তব্য। পথিমধ্যে যদি এমন কোন গ্রাম না পড়ে যেখানে মসজিদ এবং মিহরাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কিবলা নির্ণয় করা যাইতে পারে তবে সফরে যাত্রা করিবার পূর্বে কিবলা পরিচয় ও নামাযের ওয়াক্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জন করা মুসাফিরের অবশ্য কর্তব্য। মুসাফিরের এতটুকু জানিয়া লওয়া আবশ্যক যে, জুহরের নামাযের সময় কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলে সূর্য কোথায় থাকে এবং উদয় ও অস্তের সময় কোন্ দিকে থাকে; আর ধ্রুব নক্ষত্র কোন্ দিকে পড়ে; রাস্তায় কোন পাহাড় থাকিলে উহা কিবলার ডানদিকে পড়ে, না বামদিকে পড়ে। এই পরিমাণ জ্ঞানার্জন করিয়া ভ্রমণে বাহির হওয়া প্রত্যেক মুসাফিরের কর্তব্য।

অষ্টম অধ্যায়

সমা' ১

সমা'জনিত মূর্ছার নিয়ম ও সমা'র বিধান

ইন-শাআল্লাহ্, সমা' সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় দুইটি অনুচ্ছেদে বর্ণনা করিব।

(১) সমা' (سماع) আরবী শব্দ। ইহার অর্থ শ্রবণ করা। ইহা সঙ্গীত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধুনা প্রচলিত 'কাওয়ালী', নৃত্য-গীত, বাদ্যানুষ্ঠান, ও ক্রীড়া-কৌতুকের সহিত এই অধ্যায়ে বর্ণিত সমা'-এর কোনই সম্পর্ক নাই। এই অনুচ্ছেদের শেষাংশ ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ পাঠে ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। অধুনা প্রচলিত 'কাওয়ালী,' নৃত্য-গীত, বাদ্যানুষ্ঠানাদি যে শরীয়তমতে হারাম, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাঠকগণ হযরত ইমাম গায্যালী (র)-এর বর্ণনা হইতে মনগড়া ভুল অর্থ গ্রহণ করিয়া মূর্খ ও ভণ্ড ফকীরদের ন্যায় নর্তন-কূর্দন গীত-বাদ্যাদিকে জায়েয বলিয়া নিজেদের ঈমান নষ্ট করিবেন না।

প্রথম অনুচ্ছেদ

কোন্ প্রকারের সমা' বৈধ ও কোন্ প্রকার অবৈধ ঃ এই কথাটি উত্তমরূপে উপলব্ধি কর এবং এই অবস্থাটি ভালরূপে বুঝিয়া লও যে, লৌহ ও প্রস্তরের মধ্যে যেমন অগ্নি নিহিত রহিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা মানব হৃদয়েও তদ্রুপ একটি গূঢ় ভাব গুপ্ত রাখিয়াছেন। লৌহ দ্বারা প্রস্তরের উপর আঘাত করিলে যেমন সেই অগ্নি বাহির হইয়া পড়ে এবং বন-জঙ্গলে লাগিয়া যায়, তদ্রুপ মধুর এবং ছন্দযুক্ত সুর শ্রবণেও মানব হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠে এবং স্বতঃই হৃদয়ে এক গূঢ় ভাবের উৎপত্তি হয়। এই ভাব প্রতিরোধে মানুষের কোন ক্ষমতা নাই।

আলমে আরওয়াহ নামে পরিচিত আধ্যাত্মিক জগতের সহিত মানব আত্মার যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তজ্জন্যই হৃদয়ে আলোড়ন ও সেই ভাবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জগত সকল শোভা ও সৌন্দর্যের জগত এবং সাদৃশ্যই সকল শোভা ও সৌন্দর্যের উৎস। আর এই জগতের সাদৃশ্যমান বস্তু সেই আধ্যাত্মিক জগতেরই কোন সৌন্দর্যের বিকাশ বটে এবং এই জড় জগতে যে সকল শোভা ও সৌন্দর্য রহিয়াছে উহা

সেই আধ্যাত্মিক জগতের শোভা ও সৌন্দর্যেরই ফল। সুতরাং ইহজগতের ছন্দযুক্ত সুমধুর সুরও সেই আধ্যাত্মিক জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যাবলীর সহিত সাদৃশ্য রাখে। এই জন্যই সুমধুর তান মানব -হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং এক প্রকার আলোড়ন ও উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলে। ইহা যে কি তাহা সম্ভবত মানুষ স্বয়ং উপলব্ধিও করিতে পারে না। যে অন্তর সর্বপ্রকার ভাবাবিল্য হইতে মুক্ত, তাহাতেই এই আলোড়ন ও উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যে অন্তর মুক্ত নহে; বরং কোন কিছুর সহিত আসক্ত রহিয়াছে সেই অন্তর যে বস্তুর প্রতি আসক্ত, কোন সুমধুর তান শ্রবণে সেই বস্তুটি তাহার অন্তরে এমনভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠে যেমন অগ্নিতে ফুৎকার দিলে অগ্নি তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠে। অতএব যে হৃদয়ে আল্লাহর প্রেমানল বিদ্যমান রহিয়াছে উহাকে আরও প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য সমা' আবশ্যক। অপর পক্ষে যে হৃদয়ে কোন প্রকার কদর্য আসক্তি রহিয়াছে তাহার জন্য সমা' হারাম এবং প্রাণ সংহারক বিষসদৃশ।

সমা' মুবাহ্ না হারাম ঃ সমা' মুবাহ্, না হারাম, এ সম্বন্ধে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। যে আলিম হারাম বলিয়াছেন তিনি কেবল সমা'র বাহিরের দিকটাই বিচার করিয়াছেন। বাস্তব পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা মানব হৃদয়ে সমাবেশ হইতে পারে, ইহা তিনি ভাবিতেও পারেন না। এই শ্রেণীর বাহ্য দৃষ্টিসম্পন্ন আলিম বলিয়া থাকেন, মানুষ কেবল নিজের স্বজাতিকেই ভালবাসিতে পারে। যে বস্তু তাহার স্বজাতীয় নহে এবং যাহার সহিত কোন কিছুরই সাদৃশ্য নাই, তাহাকে মানুষ কিরূপে ভালবাসিতে পারে ? অতএব এইরূপ আলিমের মতে সৃষ্ট পদার্থের ভালবাসা ব্যতীত মানুষের অন্তরে অপর কোন বস্তুর ভালবাসা স্থান পাওয়া সম্ভব নহে। যদি কোন মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র ভালবাসা স্থানলাভ করিয়া থাকে তবে উক্ত আলিম উহাকে কাল্পনিক ও কোন সাদৃশ্য বস্তুর প্রেম কল্পনায় বাতিল বলিয়া মনে করেন। এই জন্যই তিনি বলিয়া থাকেন সমা' নিছক আমোদ-প্রমোদ অথবা সৃষ্ট পদার্থের প্রতি আসক্তি হইতে উদ্ভুত। এই উভয়টিই ধর্মমতে মন্দ ও নিন্দনীয়। "আল্লাহ্কে ভালবাসা মানুষের প্রতি ওয়াজিব" এই কথার অর্থ এই শ্রেণীর আলিমকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তরে বলেন, "ইহার অর্থ, আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধসমূহ মানিয়া চলা ও তাঁহার ইবাদত করা।" এই শ্রেণীর আলিমগণ এ স্থলে বড় ভুল করিয়াছেন। অত্র গ্রন্থের 'পরিত্রাণ খণ্ডে' 'মহব্বত' অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হইবে। এখানে আমার বক্তব্য এই যে; সমা' শ্রবণ – ।ধন্ধে নিজের অন্তরের নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। কারণ, যে বস্তু হৃদয়ে আদৌ নাই, সম' তাহা জন্মাইয়া দিতে পারে না; বরং যাহা অন্তরে বিদ্যমান আছে সমা' শুধু উহাকেই আলোড়িত করে। যাহার অন্তরে এমন ভাব বিদ্যমান যাহা শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় এবং যাহাকে শক্তিশালী

করিয়া তোলাও বাঞ্ছনীয়, যদি সমা' শ্রবণে উহা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে তবে শ্রবণকারী সওয়াব পাইবে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তির অন্তরে এমন ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ও মন্দ, সমা' শ্রবণ করিলে সে শাস্তির উপযোগী হইবে। আবার যে ব্যক্তির অন্তর এই উভয়বিধ ভাব হইতে মুক্ত, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় সমা' শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করে, তাহার জন্য সমা' মুবাহ্। অতএব, অবস্থা-ভেদে সমা' তিন প্রকার।

প্রথম প্রকারঃ অসাবধান গাফিলদের ন্যায় লোকে বিবেচনাশূন্যতা ও অসতর্কতাবশতঃ খেল-তামাশা স্বরূপ সমা' শ্রবণ করিয়া থাকে। যেহেতু গোটা দুনিয়াই একটা বিচিত্র খেলা ও তামাশা, সুতরাং এই শ্রেণীর লোকের জন্য সমা'ও এই ধরনের তামাশারই অন্তর্ভুক্ত। সমা' আনন্দদায়ক এবং ভাল লাগে বলিয়াই হারাম, এইরূপ উক্তি করা সঙ্গত নহে। কারণ, সব আনন্দ হারাম নহে। আনন্দদায়ক বস্তুর মধ্যে যাহা হারাম তাহা আনন্দদায়ক ও ভাল লাগে বলিয়াই হারাম নহে; বরং ইহাতে যে অনিষ্টকারিতা ও ফিতনা-ফাসাদের কারণ রহিয়াছে তজ্জন্যই উহা হারাম হইয়াছে। পাখির সুমিষ্ট সুর আনন্দদায়ক ও চিত্তকর্ষক। অথচ ইহা হারাম নহে। সবুজ প্রান্তরে, প্রবাহিত স্রোতস্বিণীর কিনারে প্রস্ফটিত পুষ্প ও অফুটন্ত পুষ্প কলিকাময় উদ্যানে ভ্রমণ, এই সমস্তই আনন্দদায়ক এবং ভাল লাগে; কিন্তু এই ভ্রমণ হারাম নহে। কর্ণের জন্য সুমধুর তান ঠিক তেমনই আনন্দদায়ক যেমন চক্ষুর জন্য সবুজ বর্ণের বিচিত্র বৃক্ষলতা পরিশোভিত প্রান্তর ও স্রোতস্বিণীর চিত্তাকর্ষক দৃশ্য আনন্দদায়ক এবং নাসিকার জন্য কস্তুরীর ঘ্রাণ আরামদায়ক; রসনার জন্য উপদেয় ও সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্য তৃপ্তিকর এবং বুদ্ধির নিকট সূক্ষ্ম জ্ঞানচর্চা আনন্দদায়ক, এইরূপে চক্ষু, নাসিকা, রসনা ও বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গুলির প্রত্যেকেই যথাক্রমে মনোরম দৃশ্য, সুগন্ধি প্রভৃতি হইতে এক-এক প্রকারের স্বাদ লাভ করিয়া থাকে। তবে সমা'র সুমধুর তান শ্রবণের আনন্দ উপভোগ করা কর্ণের পক্ষে কেন হারাম হইবে ? সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রাণ লওয়া, সবুজ প্রান্তরের মনোরম শোভা দর্শন ইত্যাদি তো হারাম নহে।

উহার প্রমাণ এই, হযরত আয়েশা (রা) আনহা হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা ঈদের দিন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হাবশী বালকগণ মসজিদে ক্রীড়া করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি উহা দেখিতে চাও ? (তখন হয়রত আয়েশা (রা) অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন)। আমি বলিলাম ঃ হ্যাঁ, দেখিতে চাই। তিনি দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া নিজের পবিত্র বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন। আমি তাঁহার বাহুর উপর আমার চিবুক স্থাপন পূর্বক ক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। আমি এইরূপ দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া তাহা দর্শনপূর্বক আমোদ-উপভোগ করিলাম যে, তিনি কয়েকবার আমাকে

বলিলেন ঃ যথেষ্ট হয় নাই কি ? আমি উত্তর করিলাম ঃ না । পুর্বেও এই হাদীসখানা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই হাদীস হইতে দেখা যায়;

ক. নির্দোষ ক্রীড়া সর্বদা না হইয়া কখন কখন হইলে তাহা দর্শন ও উপভোগ করা হারাম নহে। আর হাবশীদের উক্ত ক্রীড়া ছিল (প্যারেড) নৃত্য ও বীরত্বগাথা সমা'।

খ. উক্ত ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও সমা' মসজিদে হইয়াছিল।

গ. যে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে ক্রীড়াস্থলের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন তখন তিনি হাবশী বালকদিগকে ক্রীড়া করিতে বলিয়াছিলেন। উহা হারাম হইলে তিনি এরূপ বলিতেন না।[১]

ঘ. হুযুর (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ তুমি কি উহা (ক্রীড়া) দেখিতে চাও ? এই জাতীয় কথাকে (تقاضا) উৎসাহ প্রদান বলে। ঘটনা এমন ছিল যে, হযরত আশেয়া (রা) নিজেই ক্রীড়া দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং হুযূর (সা) নীরব ছিলেন। তাহা হইলে কেহ হয়ত বলিতে পারিত, হুযূর হযরত আয়েশা (রা)-কে মনঃকষ্ট প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কারণ, কষ্ট প্রদান করা মন্দ স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত।

---

১. এই ঘটনার সময় পরপুরুষ ও পর-নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা অবৈধ ছিল না।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ–

"আপনি ঈমানদার নারীদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে।" এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর পরপুরুষের ক্রীড়া-কৌতুক দর্শন তো দূরের কথা, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও হারাম হইয়া পড়িয়াছে।

এতদ্ব্যতীত হযরত ইমাম গায্যালী (র) কোন কোন নির্দোষ ক্রীড়া-কৌতুকের বৈধতার প্রমাণ দিতে যাইয়া যে হাদীসখানার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে যেন কোন পাঠক এই ধোঁকায় পতিত না হন যে, অধুনা প্রচলিত যৌন আবেদনপূর্ণ যাবতীয় ক্রীড়া-কৌতুক, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান বৈধ হইবে। উক্ত হাদীসে যে ক্রীড়ার কথা উল্লেখ রহিয়াছে উহার অর্থ যুদ্ধপ্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ এবং প্যারেড অনুষ্ঠান। হাদীসের ব্যাখ্যায় যে সমা'র বিষয় হযরত ইমাম গায্যালী (র) উল্লেখ করিয়াছেন উহা বর্তমানের অশ্লীল ও কুপ্রবৃত্তি জাগরণকারী নৃত্য ও সমা' নহে। উহা ছিল তখনকার দিনের যোদ্ধাদিগকে সমরোত্তেজনা প্রদানের নিমিত্তে প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'জঙ্গে বুআসে' পঠিত উত্তেজনামূলক বীরত্বপুর্ণ কবিতা। কুরআনের যুদ্ধাগ্নি 'আউস' এবং 'খাজরায' গোত্রে একাধারে একশত বিশ বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত ছিল। এই যুদ্ধে আরবের বহু বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কাহিনী কবিতাকারে পুনারাবৃত্তি করিয়া সেনাবাহিনীকে সমরোন্মাদনা প্রদান করা হইত যেন তাহারা সদর্পে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং ইহাতে এতদ্দেশ্যের অনুশীলণ নাচ-গান-বাদ্যের বৈধতার প্রশ্ন মোটেই উঠে না; বরং হানাফী মাযহাব ও অন্য সকল ইমামের সর্ববাদীসম্মত মতে অশ্লীল নৃত্য-গীত, ক্রীড়া-কৌতুক ও বাদ্যানুষ্ঠান সম্পূর্ণ হারাম। (আইনী শরহে বুখারী দ্রষ্টব্য)

ঙ. স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-এর সহিত অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান ছিলেন যদিও তামামা দেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। ইহাতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোক ও বালকদের মনস্তুষ্টির জন্য তাহাদের নির্দোষ আনন্দ ও আমোদের কার্যে তাহাদের আনুকূল্য করা সৎস্বভাবের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মনিগ্রহ ও ধার্মিকতা প্রদর্শন অপেক্ষা উহা উৎকৃষ্ট।

সহীহ হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি যখন ছোট বালিকা ছিলাম তখন বালিকাসুলভ স্বভাববশতঃ কাপড় দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ খেলনা বানাইতাম এবং আরও কতিপয় বালিকা (আমার সহিত যোগদানের নিমিত্তে) আসিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করিলে অন্যান্য বালিকা পলায়ন করিত। হুযূর (সা) আবার তাহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। একদা তিনি একটি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এই খেলনাগুলি কি ? বালিকাটি নিবেদন করিল ঃ এইগুলি আমার কন্যা। হুযূর (সা) আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ উহাদের মধ্যস্থলে ওটা কি বাঁধা রহিয়াছে ? সে নিবেদন করিল ঃ এইটি এই (পুরুষ) খেলনাগুলির ঘোড়া। হুযূর (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ঘোড়ার (পিঠের) উপর ওটা কি ? সে উত্তর করিল ঃ উহা ঘোড়ার পাখা। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ ঘোড়ার পাখা কোথা হইতে আসিল ? সে উত্তর করিল ঃ আপনি কি শোনেন নাই যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর ঘোড়ার পাখা ছিল? ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, ইহাতে তাঁহার সমুদয় দন্তপাটি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

উপরিউক্ত হাদীস এস্থলে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা হইতে বুঝা যাইবে, পরহিযগারী প্রদর্শন ও নীরসভাব ধারণ করা এবং উল্লেখিত কার্য হইতে নিজকে দূরে সরাইয়া রাখা ধর্ম-কর্মের অন্তর্ভুক্ত নহে। বিশেষতঃ সরলমতি বালক-বালিকা ও অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহাদের উপযোগী যে সকল নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের আনুকূল্য করা যেন অশোভন বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়। অবশ্য এই হাদীস দ্বারা ছবি প্রস্তুত করা দুরস্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় না। কারণ, বালক-বালিকাদের খেলনা কাষ্ঠ ও ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং পূর্ণ আকৃতি ইহাতে প্রস্তুত হইতে পারে না। কেননা, আলোচ্য হাদীসে উল্লেখ আছে যে, উক্ত ঘোড়াটির কেশর ছিল ছিন্ন বস্ত্রে প্রস্তুত।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ ঈদের দিন দুইটি বালিকা দফ বাজাইয়া আমার নিকট সমা' আবৃত্তি করিতেছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহে আগমন করিলেন এবং অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কাপড় মোড়া দিয়া শুইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে হযরত আবূবকর (রা) আগমন করিলেন এবং সেই বালিকাদ্বয়কে ধমক দিয়া বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর গৃহে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র! ইহা শুনিয়া

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হে আবূবকর! তাহাদিগকে বাধা দিও না; কেননা আজ ঈদের দিন। এই হাদীস হইতে বুঝা যায়, দফ বাজাইয়া সমা' আবৃত্তি মুবাহ্ (বৈধ)। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, আওয়াজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্ণ মুবারকে পৌঁছিতে ছিল। তাঁহার শ্রবণ এবং হযরত আবূবকর (রা)-কে বাধা প্রদান করিতে নিষেধ করা হইতে বুঝা যায় যে, দফ বাজান ও সমা' আবৃত্তি করা মুবাহ্ (বৈধ)।[১]

দ্বিতীয় প্রকার ঃ হারাম সমা'। হৃদয়ে কোন মন্দভাব থাকিলে, যেমন, কাহারও হৃদয়ে কোন কূলটা রমণী কিংবা কোন ছোক্‌রার প্রতি আসক্তি রহিয়াছে, উক্ত রমণী কিংবা ছোক্‌রাকে সম্মুখে রাখিয়া মিলন-স্বাদ অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সমা'র সুমধুর সুর শ্রবণে মত্ত হওয়া; অথবা সেই রমণী বা ছোক্‌রার অনুপস্থিতিতে তাহার সহিত মিলনের আশায় সমা' শ্রবণে প্রবৃত্ত হওয়া যাহাতে অনুরাগ ও আসক্তি বৃদ্ধি পায়; অথবা আলঙকারিক ভাষায় মন, কৃষ্ণ কেশরাশি, অঙ্গ সৌষ্ঠব ও অপরূপ সৌন্দর্য সংবলিত সমা' শ্রবণে লিপ্ত হইয়া নিজের প্রিয়জন অর্থাৎ সেই কূলটা বা ছোক্‌রার রূপ কল্পনায় বিভোর হওয়া-এই সকল সমা' শ্রবণ করা হারাম। যুবক-দলের অধিকাংশ এই শ্রেণীর আপদে নিপতিত থাকে। এই জাতীয় সমা' এইজন্য হারাম যে, ইহাতে শরীয়ত বিরোধী কুৎসিৎ কামাগ্নি উত্তেজিত হইয়া উঠে। অথচ এই শ্রেণীর কামাগ্নি নির্বাপিত করা ওয়াজিব। সুতরাং ইহাকে উত্তেজিত করিয়া তোলা কিরূপে জায়েয হইবে? কিন্তু নিজের স্ত্রী বা ক্রীতদাসীর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সমা' শ্রবণ করা পার্থিব ভোগ-বিলাসের অন্তর্ভুক্ত। স্ত্রীকে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত এবং ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করিয়া না ফেলা পর্যন্ত এইরূপ সমা' মুবাহ্। স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ও ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবার পর অবশ্যই হারাম হইবে।

---

১. আলিমগণের মতে এই হাদীস দ্বারা সমা' মুবাহ্ (বৈধ) বলিয়া প্রমাণিত হয় না। এত্যদ্ব্যতীত অন্যান্য সহীহ্ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, এই শ্রেণীর সমা' মুবাহ্ নহে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে হযরত আবূবকর (রা)-বালিকাদ্বয়কে সমা' হইতে বাধা প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহার অর্থ এই নয় যে, সমা' মুবাহ্; বরং নিষেধের কারণ এই যে, বালিকাদ্বয় অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিল, তখনও তাহাদের উপর শরীয়তের আদেশ-নিষেধ বর্তে নাই এবং উহা ছিল ঈদের দিন। যেহেতু ঈদ আনন্দ ও খুশির দিন, এই জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত নাবালেগ বালিকাদ্বয়ের সাময়িক আনন্দে ব্যাঘাত পছন্দ করেন নাই। আর বালিকাদ্বয় পেশাগত গায়িকাও ছিল না যে, কেবল গান গাহিয়াই বেড়াইত। এই কারণেই সহীহ্ মুসলিমের অন্য রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ ليستا بمغنيتين "তাহারা গায়িকা ছিল না।" ইহাতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, উহা কেবল ঈদের দিনে অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাদের শিশুসুলভ আমোদ-প্রমোদ ছিল মাত্র। ইহাতে সমা' মুবাহ্ বলিয়া প্রমাণিত হয় না। আর সমা' বা গান বলিতে আজকাল যাহা বুঝা যায়, উহা তাহা ছিল না; বরং উহা ছিল আনসারগণ কর্তৃক 'জংগ বুআসে' পঠিত বীরত্বসূচক কবিতা।

তৃতীয় প্রকার ঃ সদ্ভাব বর্ধক সমা'। হৃদয়ে কোন সদ্ভাব থাকিলে এই মর্মের সমা' উক্ত সদ্ভাবকে সবল করিয়া তোলে। এই প্রকার সমা' চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী ঃ কা'বা শরীফের মাহাত্ম্য, হজ্জের পথস্থিত প্রান্তর ও জঙ্গলের বিবরণ সংবলিত কবিতা আবৃত্তি, যেমন এইরূপ সমা' শ্রবণে শ্রোতার অন্তরে বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারতের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় এবং হৃদয়ে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। যাহার জন্য হজ্জ করা জায়েয তাহার পক্ষে এই জাতীয় সমা' শ্রবণে হজ্জের প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়া সওয়াবের কারণ বটে। কিন্তু মাতাপিতা যাহাকে হজ্জে গমনের অনুমতি দেন না অথবা কোন কারণ বশত ঃ হজ্জে যাওয়া যাহার অনুচিত, সমা' শ্রবণ করতঃ তাহার অন্তরে হজ্জের বাসনা দৃঢ় ও মজবুত করিয়া তোল দুরস্ত নহে। কিন্তু যাহার মনে এতটুকু বল আছে যে, সমা' শ্রবণে হজ্জের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিলেও সে উহা দমন করিয়া রাখিতে পারিবে এবং নিজের অবস্থায় স্থির থাকিতে পারিবে তবে তাহার জন্য উহা শ্রবণে বাধা নাই।

ধর্ম যোদ্ধাগণের হৃদয়ে জিহাদের প্রেরণা জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে বীরত্বগাঁথা ও সমা'র বিধানও প্রায় একইরূপ। কারণ, এই শ্রেণীর কবিতাবৃত্তি ও সমা' মানুষকে আল্লাহ্‌র মহব্বতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার এবং তাঁহার ধর্ম রক্ষার্থে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়া তোলে। ইহাও সওয়াবের কাজ। রণোন্মাদনা বর্ধক ও বীরত্বব্যঞ্জক যে সকল গাঁতা সচরাচর যুদ্ধক্ষেত্রে গাহিয়া সৈন্যদের হৃদয়ে সাহস ও যুদ্ধস্পৃহা বৃদ্ধি করিয়া তোলা হয়, যাহার ফলে জীবনের মায়া পরিত্যাগ করতঃ সৈন্যগণ যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে, সেই যুদ্ধ কাফিরদের বিরুদ্ধে হইয়া থাকিলে বীরত্বব্যঞ্জক কবিতার সাহায্যে এইরূপ সাহসবর্ধনে সওয়াব আছে। কিন্তু মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তদ্রূপ সাহস বর্ধক কবিতা আবৃত্তি হারাম।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ অনুতাপবর্ধক সমা' যে সমা' শ্রবণে শ্রোতার হৃদয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পাপানুষ্ঠানজনিত অনুতাপের বন্যা প্রবাহিত হয় এবং আল্লাহ্‌র নিকট উচ্চ মর্যাদা ও তাঁহার সন্তুষ্টিলাভে বঞ্চিত থাকার ক্ষোভে অশ্রু নির্গত হইতে থাকে, এইরূপ সমা' শ্রবণেও সওয়াব হয়। হযরত দাউদ (আ)-এর শোক গাঁথা এই রূপই ছিল। কিন্তু যে সকল বিষয়ে শোক ও বিলাপ করা হারাম, সামা'র মাধ্যমে সেই বিষয়ে সুপ্ত শোক জাগাইয়া তোলাও হারাম। যেমন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যুতে শোক ও বিলাপ করা হারাম। কারণ আল্লাহ্ বলেন ঃ

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ-

যাহা গত হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য তোমরা শোক করিও না।

আল্লাহ্‌র বিধানে অসন্তুষ্ট হইয়া যদি কেহ শোকাতুর হয় এবং সেই শোক-সন্তাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য শোকগাঁথাপূর্ণ সমা' শ্রবণ করে, তবে তাহাও হারাম। এই জন্যই বিলাপকারীর পারিশ্রমিক হারাম এবং সে মহাপাপী। এমনকি, সেই বিলাপ শ্রবণকারীও পাপী হইবে।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ যে সকল বিষয়ে আনন্দিত হওয়া শরীয়ত অনুসারে জায়েয আছে, এইরূপ কোন আনন্দ হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিলে তাহা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আনন্দ বর্ধক সমা' শ্রবণ করা বৈধ ও মঙ্গলজনক। যেমন, বিবাহ উৎসব, ওলীমা, আকীকা উৎসবে অথবা সন্তান জন্মের সময়ে, খৎনাকরণে কিংবা বিদেশ হইতে প্রিয়জনের প্রত্যাবর্তনে আনন্দ করা বৈধ। মক্কা শরীফ হইতে হিজরত করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনা শরীফে পৌঁছিলেন তখন মদীনাবাসিগণ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলেন এবং দফ বাজাইয়া নিম্নোক্ত কবিতাটি গাহিয়া গাহিয়া আনন্দ করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন ঃ

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوِدَاعِ- وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَادَعَا لِلّٰهِ دَاعِ-

বিদায়ের সানিয়া পাহাড়ের পথ বাহিয়া আমাদের ভাগ্যাকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে। অতএব যতদিন প্রার্থনাকারী আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করিবে ততদিন আমাদের উপর শোকর গুযারী করা ফরয হইয়া পড়িয়াছে।

অনুরূপভাবে ঈদের দিনে আনন্দ করা দুরস্ত এবং তজ্জন্য সমা'ও বৈধ। এইরূপে ধর্মবন্ধুগণ পরস্পর মিলিত হইয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে একে অন্যকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আনন্দবর্ধক কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে।

চতুর্থ শ্রেণী ঃ ইহাই আসল সমা'। কাহারও হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা প্রবল হইয়া প্রেমের স্তরে উন্নীত হইলে তাহার জন্য সমা' আবশ্যক এবং কতকগুলি গতানুগতিক নেককার্য অপেক্ষা সম্ভবতঃ ইহাই অধিকতর কার্যকরী হইয়া থাকে। আর যে কার্যে আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পায় ইহার মুল্য অবশ্যই অধিক। এইজন্য সুফীগণ সমা' শ্রবণ করিতেন। কিন্তু আজকাল যে সকল লোক বাহিরে সূফীগণের বেশ-ভূষা ধারণ করিয়া থাকে, অথচ অন্তরে সূফীগণের গণাবলী হইতে শূন্য, তাহাদের কারণেই এখন সমা' একটি গতানুগতিক প্রথা হইয়া পড়িয়াছে। আল্লাহ্‌র প্রেমের আগুন অন্তরে প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য সমা'র প্রভাব অত্যাধিক। সূফীগণের মধ্যে এমন অনেক আছেন, সমা'র মোহে তন্ময় থাকাকালে যাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই অবস্থায় তাঁহারা এমন এক সুখাস্বাদ উপভোগ করিয়া থাকেন যাহা সমা' ব্যতীত লাভ করা যায় না। সমা'র প্রভাবে অদৃশ্য জগতের

যে সকল অবস্থা তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে, উহাকে তাঁহারা অজদ বলিয়া থাকেন। রৌপ্য অগ্নিতে পোড়াইলে উহা যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সমা' শ্রবণে তাঁহাদের হৃদয়ও তদ্রুপ পবিত্র ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সমা' অন্তরে আগুন জ্বালাইয়া দেয় এবং অন্তরের সকল মলিনতা বিদূরীত করে। অন্তরে দহনশীলতা উৎপত্তি করিয়া ইহার মলিনতা দূরীকরণে সমা' দ্বারা যতখানি সাফল্য অর্জন করা যায় বহু সাধনা দ্বারা উহা লাভ করা যায় না।

আধ্যাত্মিক জগতের সহিত মানবাত্মার যে গোপন সম্পর্ক রহিয়াছে, সমা' সে গোপন সম্পর্কের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং আত্মাকে ইহজগত হইতে একেবারে পরজগতে লইয়া যায়। এমনকি ইহজগতে যাহা সংঘটিত হয়, সূফী তখন ইহার কোন টেরই পান না। এমনও হইয়া থাকে যে, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে লুটিয়া পড়েন। এই প্রকার অবস্থাসমূহের মধ্যে যেগুলি সত্য ও প্রকৃত, উহাদের অতি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা রহিয়াছে। সভাস্থ যে ব্যক্তি এই অবস্থাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিতে পারে সেও উহার বরকত হইতে বঞ্চিত থাকে না। কিন্তু এ সমস্ত অবস্থার মধ্যে অপ্রকৃতের সংখ্যাই অধিক এবং উহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে ভুল-প্রমাদ অনেক ঘটিয়া তাকে। উহাদের মধ্যে কোনটি সত্য ও কোনটি মিথ্যা পরিপক্ব ও অভিজ্ঞ পীর ব্যতীত কেহই তাহা বুঝিতে পারেন না। মুরীদের সমা' শুনিবার বাসনা মুক্ত না হইলে স্বেচ্ছায় ইহা শ্রবণে লিপ্ত হওয়া তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে।

হযরত শায়খ আবুল কাসেম গুরগানী (রা)-এর অন্যতম মুরীদ আলী হাল্লাজ একদা সমা' শ্রবণের অনুমতি চাহিলে হযরত শায়খ (র) বলিলেন ঃ একাধারে তিনদিন উপবাস কর। তৎপর তোমার জন্য সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করা হউক। এমতাবস্থায় তুমি যদি সেই খাদ্য-দ্রব্য পরিত্যাগ করতঃ সমা' শ্রবণে লিপ্ত হও তবে তোমার সমা' শ্রবণের বাসনা সত্য এবং ইহা শ্রবণের অধিকার তোমার আছে। কিন্তু যে মুরীদের অন্তরের অবস্থা এখনও উন্মুক্ত হয় নাই এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানই লাভ করে নাই অথবা তাহার অন্তরের অবস্থা তো উন্মুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি এখনও সম্পূর্ণরূপে সংযত ও পর্যুদস্ত হয় নাই এমন মুরীদকে সমা' শ্রবণ হইতে নিবৃত্ত রাখা পীরের উপর ওয়াজিব। কারণ, সমা' এমন মুরীদের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই করিবে অধিক।

সূফীগণের সমা', অজ্‌দ (ভাবোন্মত্ততা), ও বিশেষ অবস্থা যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহারা কেবল নিজেদের অন্তরের সংকীর্ণতা ও দৃষ্টিশক্তির অপরিসরতার দরুনই অবিশ্বাস করিয়া থাকে। এ ব্যাপারে তাহারা ক্ষমার্হ (মা'যূর) এবং দোষহীন। কারণ, তাহারা স্বয়ং যাহা লাভ করে নাই, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাহাদের জন্য নিতান্ত

কঠিন। তাহাদিগকে নপুংসকের সহিত তুলনা করা যায়। স্ত্রী সহবাসে কি আনন্দ, নপুংসক তাহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারে না। কারণ, কাম-শক্তির কারণেই মানুষ এই সুখ উপভোগ করিতে পারে। যেহেতু আল্লাহ্ নপুংসকের কামভাবই সৃষ্টি করেন নাই, সুতরাং স্ত্রী সহবাসের আনন্দ সে কিরূপে উপলব্ধি করিবে ? সবুজ প্রান্তর এবং কল কল নাদে প্রবাহিত স্রোতস্বিনীর শোভা দর্শন করিলে চক্ষু যে আনন্দ লাভ করে, জন্মান্ধ ব্যক্তি তাহা অস্বীকার করিলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কারণ, আল্লাহ তাহাকে সেই ইন্দ্রিয়ই দান করেন নাই যদ্দ্বারা সে মনোরম দৃশ্যাবলী দর্শনের আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে। নেতৃত্ব, প্রভুত্ব, রাজত্ব এবং দেশ শাসন কার্যে যে সুখ রহিয়াছে, কোন অবোধ বালক উহা অস্বীকার করিলে তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে ? কারণ, সে কেবল খেল-তামাশাই বুঝে; রাজ্য শাসনে কি আনন্দ তাহা সে কিরূপে বুঝিবে ? প্রিয় পাঠক ! এতটুকু বুঝিয়া লও যে, বিজ্ঞই হউক, আর অজ্ঞই হউক, যাহারা সুফীগণের অনুপম অবস্থাকে অবিশ্বাস করে, তাহারা শিশুসদৃশ্য কারণ, যে বস্তুর মাহাত্য তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাহারা উহার অস্তিত্বই অস্বীকার করিতেছে। যাহার বিন্দুমাত্রও বুদ্ধি আছে, সে স্বীকার করে এবং বলে ঃ যদিও আমি সূফীগণের অবস্থা হইতে বঞ্চিত ; তথাপি এতটুকু বুঝি যে, সূফীগণের পক্ষে সেই অবস্থা প্রাপ্তি অসম্ভব নহে। তবুও ভাল যে, সে সেই অবস্থার প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সূফীগণের সেই অবস্থা প্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া মনে করে। কিন্তু নিজে যাহা লাভ করিতে পারে নাই অপরের জন্যও তাহা লাভ করা অসম্ভব -এইরূপ যে মনে করে, সে নিতান্ত মূর্খ। এই শ্রেণীর লোকদের সম্মন্ধেই আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ-

আর যখন তাহারা সেইদিকে পথ পায় নাই তখন তাহারা বলে, ইহা পুরাতন মিথ্যা।

নির্দোষ সমা' ও হারাম হওয়ার কারণসমূহ ঃ যে সমা' উপরে মুবাহ্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, পাঁচটি কারণে তাহাই হারাম হইয়া পড়ে। সুতরাং এই পাঁচ কারণ হইতে সযত্নে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক।

প্রথম কারণ ঃ রমণী বা শ্মশ্রুবিহীন ছোকরার সমা' শ্রবণ করা। যেহেতু তাহাদের সমা' শ্রবণে কামভাব জাগ্রহ হয়; তাই এই সমা' হারাম। শ্রবণকারীর হৃদয় আল্লাহ্র ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলেও ইহা হারাম। কারণ, কামভাব প্রকৃতিগত এবং সুদর্শন চেহারা দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ামাত্রই শয়তান সেই কামভাবকে উস্কানি দিতে থাকিবে তখন কামভাব প্রাধান্য লাভ করিবে এবং সমা' ইহার বশীভূত হইয়া পড়িবে। শ্মশ্রুবিহীন বালক কামভাবের পাত্র নহে, তাহার সমা' শ্রবণ করা মুবাহ্।

রমণী কুৎসিত হইলে সমা' গাহিবার সময় সে দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তাহার সমা' -ও শ্রবণ করা জায়েয নহে। কারণ, নারী যেরূপই হউক না কেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। কিন্তু পর্দার অন্তরাল হইতে গাহিলে যদি তাহার সুর শ্রবণ করিয়া অবৈধ প্রণয় ও ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এইরূপ সমা' শ্রবণ করাও হারাম; অন্যথায় মুবাহ্। ইহার প্রমাণ এই যে, হযরত আয়েশা (রা)'র গৃহে দুইজন বালিকা সমা' আবৃত্তি করিয়াছিল এবং তাহাদের আওয়াজ অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্ণে পৌঁছিয়া থাকিবে।

রমণীদের স্বর শ্রবণ করা এবং শ্মশ্রুবিহীন বালকদের চেহারা দর্শন করা হারাম নহে। অর্থাৎ বালকদের উপর যেমন তাহাদের চেহারা ঢাকিয়া রাখা ফরয নহে এবং তাহাদের চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করাও লোকদের জন্য হারাম নহে, তদ্রূপ নারীদের প্রতি তাহাদের কণ্ঠস্বর বন্ধ রাখা ফরয নহে এবং পরপুরুষদের জন্যও নারীদের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা হারাম নহে। কিন্তু ব্যভিচারের আশঙ্কা থাকিলে বালকদের প্রতিও কামভাবে দৃষ্টিপাত করা হারাম। তদ্রূপ অবৈধ প্রেম ও ব্যাভিচারের আশঙ্কা থাকিলে নারীদের স্বর পর্দার অন্তরাল হইতে শ্রবণ করাও হারাম। তবে মানুষের অবস্থার তারতম্যানুসারে এই বিধানের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। কারণ, কেহ কেহ কামভাবের তাড়না হইতে একেবারে নিরাপদ ও ভয়শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন; আবার অনেকেই ভয়শূন্য হইতে পারেন নাই। রোযা রাখিয়া স্বীয় স্ত্রীর মুখ-চুম্বন করার বিধানের সহিত এই বিধানের তুলনা করা যাইতে পারে। কামভাবের তাড়না হইতে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ও ভয়শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, কেবল তাঁহার জন্যই রোযা রাখিয়া স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন করা জায়েয। কিন্তু চুম্বন করিলে কামভাব উত্তেজিত হইয়া সহবাসে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা যাহার রহিয়াছে অথবা চুম্বনমাত্র শুক্র স্খলনের আশঙ্কা রহিয়াছে, রোযা রাখিয়া স্ত্রীকে চুম্বন করা তাহার জন্য জায়েয নহে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ সমা'র সহিত রুবাব, চঙ্গ, বরবত ও ইরাক দেশীয় রূদ ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্রের কোন একটি বাজনা থাকিলে সে সমা' শ্রবণ করা হারাম। কারণ রূদ নামক বাদ্য যন্ত্রের বাজনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার বাজনা সুমধুর ও সুমিল, এই জন্য ইহা নিষিদ্ধ হয় নাই; বরং ইহা শ্রুতিকটু এবং বেমিল করিয়া বাজাইলেও হারাম হইবে। ইহা এইজন্য হারাম যে, শরাবখোর লোকে শরাবপানের মজলিসে এই বাদ্য বাজাইতে অভ্যস্ত। শরাবখোরদের সহিত যে বস্তু বিশেষভাবে সম্বন্ধ রাখে, শরাব হারাম করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুও হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ, ইহা শরাবের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে এবং শরাব পানের স্পৃহা হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া দিবে। কিন্তু দফ নামক বাদ্য যন্ত্রের সহিত জলাজুল নামক জুড়ি যন্ত্র থাকিলেও অবৈধ

হইবে না। কারণ, এই সম্বন্ধে কোন বিধান প্রদান করা হয় নাই এবং ইহা রূদসদৃশ নহে; কেননা ইহা শরাবখোরদের নিদর্শন নহে। সুতরাং রূদের সহিত ইহার তুলনা করা যায় না। দফ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে বাজান হইয়াছিল। বিবাহাদি উৎসবে প্রচারের জন্য ইহা বাজাইবার অনুমতি আছে। সুতরাং দফের সহিত জলাজুল জুড়িয়া দিলেও অবৈধ হইবে না। দফ বাজান হাজী ও গাযীদের রীতি হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু নপুংসদের তবলচি বাজান জায়েয নহে।[১] কারণ, ইহা বাজানো তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। এই তবলচি লম্বা এবং মাঝখানে সরু ও দুই মাথা কিছু চওড়া, কিন্তু শাহীন যে আকৃতিরই হউক না কেন, হারাম নহে। কারণ, সেকালের রাখালগণ ইহা বাজাইতে অভ্যস্ত ছিল।

হযরত ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ শাহীন নামক বাঁশী বাজানো বৈধ হওয়ার প্রমাণই এই যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) শাহীন-এর আওয়াজ শুনিতে পাইয়া স্বীয় কর্ণ মুবারকে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া হযরত ইব্‌নে উমর (রা) কে বলিলেন, ইহার আওয়াজ থামিলে আমাকে জানাইবে। হুযূর (সা) হযরত ইব্‌নে উমর (রা)-কে শাহীনের আওয়াজ শুনিতে নিষেধ না করায় ইহাই বুঝা যায় যে, এই শাহীন বাজান মুবাহ্। কিন্তু তিনি নিজে উহার আওয়াজ হইতে স্বীয় কর্ণে অঙ্গুলী স্থাপনের কারণ এই যে, তিনি তখন কোনও উন্নত স্তরের আধ্যাত্মিক অবস্থায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, সেই আওয়াজ তাঁহার অবস্থার ব্যাঘাত ঘটাইবে এবং তাঁহার পবিত্র হৃদয়কে সেই মহান অবস্থা হইতে ফিরাইয়া লইবে। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ধ্যান হইতে সাময়িকভাবে দূরে অবস্থিত, তাহাকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করিতে সমা'র প্রভাব অত্যাধিক। কিন্তু যাহারা উন্নততর আধ্যাত্মিক অবস্থা হইতে বঞ্চিত, কেবল তাহাদের জন্যই ইহা আবশ্যক। আর যে সকল মহাপুরুষ আসল কার্যে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমজ্জিত আছেন, সমা' তাঁহাদের কোন হিত সাধন না করিয়া বরং ব্যাঘাত সৃষ্টি এবং অনিষ্ট করিতে পারে। এই জন্যই হুযূর (সা) স্বীয় কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে শাহীনের আওয়াজ শ্রবণ হারাম বলিয়া প্রমাণিত হয় না। কারণ, এমন অনেক মুবাহ্ বিষয় আছে যাহা তিনি করিতেন না। কিন্তু তিনি হযরত ইব্‌নে উমর (রা)-কে ইহার আওয়াজ শ্রবণ করিতে নিষেধ না করাতে প্রমাণিত হয়

১. ধর্ম-কর্মে একেবারে উদাসীন চরিত্রহীন অসৎ পাপী লোকেরাই অধুনা গান-বাদ্যে, নর্তন-কুর্দনে লিপ্ত হয়। সুতরাং এই সকল আল্লাহদ্রোহীদের সঙ্গে সামঞ্জস্য হওয়ার কারণে বৈধ কাজসমূহ হইতেও বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। অন্যথায় গুমরাহী আরও বৃদ্ধি পাইবে।

২. উপরিউক্ত হাদীস হইতে শাহীন নামক আওয়াজ শ্রবণ মুবাহ্ হওয়ার পক্ষে হযরত ইমাম গায্‌যালী (র) যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কতিপয় শাফিঈ আলিম ও তাঁহার ব্যক্তিগত সাময়িক মত। অন্যান্য সহীহ হাদীস ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শাহীনের সূর হারাম বলিয়াই হুযূর (সা) স্বীয় কর্ন মুবারকে আঙ্গুলি স্থাপন করিয়াছিলেন।

যে, উহা মুবাহ্ এতদ্ব্যতীত উহা জায়েয হওয়ায় পক্ষে অন্য কোন সরাসরি দলীল নাই।[১]

তৃতীয় কারণ ঃ সমা'র মধ্যে অশ্লীলতা, অপরের দুর্ণাম অথবা ধর্মের প্রতি বিদ্রুপ থাকিলে উহা শ্রবণ করা হারাম। যেমন, হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) সম্বন্ধে শিয়া সম্প্রদায়ের ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক কবিতা অথবা কোন বিখ্যাত রমনীর প্রশংসাসূচক কবিতা। কারণ, পুরুষের নিকট অপর নারীর গুণাবলী বর্ণনা করা অনুচিত; এই সমস্ত কবিতা পাঠ ও শ্রবণ উভয়ই হারাম। কিন্তু যে কবিতায় আশিকগণের অভ্যাস অনুযায়ী সাধারণভাবে কেশরাশি, আকৃতি ও সৌন্দর্যের প্রশংসা এবং মিলন ও বিচ্ছেদের বর্ণনা থাকে, উহা আবৃত্তি ও শ্রবণ হারাম নহে। কিন্তু এমন কবিতা আবৃত্তি করিলে কোন কুলটা রমণী বা শ্মশ্রুবিহীন বালকের প্রণয়ে আসক্ত ব্যক্তি যদি উহা শ্রবণ করিয়া স্বীয় প্রেমাস্পদের কল্পনায় মাতিয়া উঠে, তবে উহা হারাম হইয়া পড়ে। তবে এইরূপ কবিতা শ্রবণ করিয়া স্বীয় স্ত্রী বা ক্রীতদাসীর কল্পনা হৃদয়ে উদিত হইলে উহা হারাম হইবে না। এই শ্রেণীর কবিতা শ্রবণে সূফী ও আল্লাহ্‌র মহব্বতে লিপ্ত ও নিমজ্জিত ব্যক্তিগণের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, প্রত্যেকটি শব্দ হইতে তাঁহারা নিজেদের

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

بُعِثْتُ لِكَسْرِ الْمَزَامِيْرِ

বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করিবার জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِىْ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ-

নিশ্চয়ই বাদ্যযন্ত্র ও বাঁশীর বিলোপ সাধন করিবার জন্য আল্লাহ্ আমাকে পাঠাইয়াছেন।

তদ্রূপ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

اِسْتِمَاعُ الْمَلَاهِىْ مَعْصِيَّةٌ وَالْجُلُوْسُ عَلَيْهَا فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا مِنَ الْكُفْرِ-

গান-বাদ্য শ্রবণ করা কবিরাহ গুনাহ্ এবং ইহার আসরে যোগদান করা ফাসিকী আর গান-বাদ্য হইতে আনন্দানুভব করা কুফরী কার্য।

মুসনাদে আহমদ এবং আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رض فِى طَرِيْقٍ فَسَمِعَ مِزْمَارًا فَوَضَعَ اِصْبَعَيْهِ فِى اُذُنَيْهِ- وَنَاى عَنِ الطَّرِيْقِ اِلَى الْجَنْبِ اَلاَ خر ثُمَّ قَالَ لِىْ بَعْدَ اَنْ بَعُدَ يَا نَافِعُ! هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قُلْتُ لاَ- فَرَفَعَ اِصْبَعَيْهِ مِنْ اُذُنَيْهِ- قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم فَسَمِعَ صَوْتَ يَوْمَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ- قَالَ نَافِعٌ وَكُنْتُ اِذْ ذَاكَ صَغِيْرًا-

মানসিক অবস্থানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ প্রেয়সীর কেশরাশি দ্বারা 'কুফরের অন্ধকার' এবং মুখমণ্ডলের চাকচিক্য দ্বারা 'ঈমানের নূর' বুঝিয়া থাকেন। আর হয়ত তাঁহারা কেশরাশি দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের পথে যে সকল বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে উহা বুঝিয়া থাকেন। যেমন কোন কবি বলেন ঃ

তাঁহার কেশগুচ্ছের একটিমাত্র কেশাগ্র ধরিয়া হিসাব করিতে লাগিলাম। আশা এই যে, এইরূপে সমগ্র কেশগুচ্ছের বিস্তারিত বিবরণ পাইতে পারি। আমার মনোভাব বুঝিয়া সে হাস্য করিল, মনোরম ভ্রমর -কৃষ্ণ কেশগুচ্ছের অগ্রভাগে একটি প্যাঁচ লাগাইয়া দিল এবং আমার সমস্ত হিসাব ভুল করিয়া ফেলিল।

সুফীগণ হয়ত এই কবিতায় কেশগুচ্ছ বলিতে আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথে বাধা-বিঘ্নসমূহ বুঝিয়া থাকেন। কবিতার ব্যাখ্যা তাঁহারা এইরূপ করেন যে, কেহ যদি বুদ্ধির সাহায্যে আল্লাহ্ তা'আলার বিচিত্র মহিমাবলীর কেশাগ্র পরিমাণও উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করে এবং তখন যদি সেই উপলব্ধির ক্ষেত্রে একটুমাত্র জটিলতার উদ্ভব হয় তবে তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। হিসাবে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সমস্ত বুদ্ধি হত ও বিফল হইয়া পড়ে।

তদ্রূপ কোন কবিতায় মদ ও মাতলামির উল্লেখ থাকিলে সূফীগণ উহার প্রচলিত বা আভিধানিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া বরং তদ্দ্বারা অনুরাগ ও গভীর প্রেম বুঝিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেহ যদি এই কবিতা পাঠ করে ঃ

'হযরত নাফে' (রা) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন ঃ একদা আমি ইব্‌নে উমর (রা)-এর সহিত পথ চলিতেছিলাম। তখন তিনি বাঁশীর আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তৎপর তিনি তাঁহার অঙ্গুলীদ্বয় স্বীয় কর্ণদ্বয়ে স্থাপন করিলেন এবং তিনি ঐ রাস্তা পরিত্যাগপূর্বক অন্যদিকে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর বহু দূর যাওয়ার পর তিনি আমাকে বলিলেন ঃ হে নাফে! তুমি কিছু শুনিতে পাও কি ? আমি বলিলাম, না। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার অঙ্গুলীদ্বয় তাঁহার কর্ণদ্বয় হইতে সরাইলেন। তিনি বলিলেন- আমি রাসুলুল্লাহ্ (সা) -এর সহিত ছিলাম। তখন তিনি শাহীন বাঁশীর আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। আমি যেরূপ করিলাম তখন তিনি তদ্রূপই করিয়াছিলেন। নাফে' বলিতেছেন-'আর আমি (ইব্‌ন উমর) তখন নাবালেগ ছিলাম।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-কে বাঁশীর সুর শুনিতে নিষেধ না করাতে হযরত ইমাম গায্‌যালী (র) উহা মুবাহ্ হওয়ার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উপরিউক্ত হাদীসে সেই ইব্‌ন উমর (রা)-ই তাঁহার মতের পরিপন্থী রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উহা কিছুতেই মুবাহ্ হইতে পারে না। আর হযরত ইব্‌ন উমর (রা) স্বয়ং বলিতেছেন যে, তখন তিনি নাবালেগ ছিলেন এই কারণেই তখন তাঁহার উপর শরীয়তের বিধি-নিষেধ বর্তে নাই; যাহার দরুন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে শাহীনের ধ্বনি শুনিতে নিষেধ করেন নাই। যাহাই হউক, এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্‌র কিতাবসমূহে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহয়াউল উলূম গ্রন্থে দাওয়াত গ্রহণের শর্তসমূহ বর্ণনা করিতে যাইয়া হযরত ইমাম গায্‌যালী (র) দাওয়াতকারীর গৃহে বাদ্য যন্ত্রাদি থাকিলে দাওয়াত গ্রহণ হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বাদ্য যন্ত্রাদির ধ্বনি শ্রবণ সম্পর্কে হযরত ইমাম গায্‌যালী (র)-এর সঠিক অভিমত অতি স্পষ্টরূপেই অনুধাবন করা যায়।

দুই হাজার মণ মদ ওজন করিলেও কিছু মদ পান না করা পর্যন্ত তুমি মত্ততার স্বাদ পাইবে না।

এই কবিতার অর্থ সূফীগণ এইরূপ করিয়া থাকেন যে, বকবক করিয়া বেড়াইলে ও শিক্ষা প্রদান করিলেই ধর্ম-কর্ম সুসম্পন্ন হয় না; বরং তজ্জন্য অনুরাগ ও আসক্তির প্রয়োজন। কারণ, ভালবাসা, প্রেম, পরহিযগারী তাওয়াক্কুলের কথা দিবারাত্র মুখে মুখে আওড়াইয়া বেড়াইলে এবং এ সকল বিষয়ে ভুরি ভুরি পুস্তক রচনা করিলে ও রাশি রাশি কাগজ মসিলিপ্ত করিয়া ফেলিলেও নিজের অন্তরে সেই সকল গুণ উৎপাদন না করা পর্যন্ত এই সমস্ত বুলি আওড়ান এবং গ্রন্থ-রচনায় কোনই ফল হইবে না।

আবার যে সমস্ত কবিতায় খারাবাত অর্থাৎ মদিরালয়, প্রতিমা মন্দির কিংবা পাশা খেলার গৃহের বর্ণনা থাকে, সূফীগণ উহাতে এই সমস্তের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা খারাবাত বলিতে সে সমস্ত স্থান বুঝিয়া থাকেন, যে স্থানে মানবের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি, হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহংকার ইত্যাদি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া বিনয়, শিষ্টাচার, প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি গুণরাজি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূফীগণ 'খারাবাত' বলিতে মানবসুলভ স্বভাবের বিনাশ বুঝিয়া থাকেন। কারণ, ইহাই ধর্মের মূল অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে সকল মানবসুলভ স্বভাব ও প্রবৃত্তি রহিয়াছে সেগুলির বিনাশ সাধন করিতে পারিলেই যে সকল গুণ মানবাত্মার আসল রত্নস্বরূপ, সেগুলি তাহার মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাদের মতে যে ব্যক্তি স্বীয় কুপ্রবৃত্তির বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয় নাই, সে বেদীন। কারণ, এইগুলির বিনাশ সাধনই ধর্মের মূল কথা।

মোটকথা, সূফীগণের মানসিক অবস্থানুযায়ী ভাবার্থ গ্রহণের বিবরণ অতি বিস্তৃত। কারণ, তাঁহাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁহারা অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেকের অনুভূতি স্বতন্ত্র। কিন্তু এতটুকু বর্ণনা করিবার কারণ এই যে, কতিপয় নির্বোধ ও বিদ'আতী লোক সমস্ত বুযর্গ সূফীগণের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও নিন্দা করিয়া বলিয়া থাকে, তাঁহারা প্রিয়তমার প্রতিমূর্তি, রমণীর কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, গণ্ডের তিলকবিন্দু, মদমত্ততা, মদিরালয়ের বিবরণ সংবলিত কবিতা আবৃত্তি ও শ্রবণ করেন, অথচ উহা হারাম। আর এই নির্বোধগণ মনে করে তাহাদের এইরূপ উক্তি সূফীগণের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি ও তাহারা তাঁহাদের যে নিন্দা করিল তাহা উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই অবিশ্বাসীর দল এই বুযর্গগণের উন্নত অবস্থার বিন্দুমাত্রও খবর রাখে না। অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে; বরং কেবল ধ্বনি শ্রবণে আপনা আপনি এই সকল বুযর্গ মূর্ছিত হইয়া পড়েন। এইজন্যই শাহীন নামক বাঁশীর সুমধুর তানের কোন অর্থ না থাকিলেও ইহাই অনেক সূফীর সংজ্ঞা হারাইবার কারণ হইয়া থাকে। এই কারণেই যে সমস্ত সূফী আরবী ভাষা অনবগত হওয়া সত্ত্বেও আরবী কবিতা শ্রবণে মূর্ছিত হইয়া পড়েন

তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া নির্বোধ লোকেরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া বলে ঃ উহারা তো আরবী কবিতা মোটেই বুঝে না, অথচ ইহা শ্রবণ করিয়া মূর্ছাগ্রস্ত হইল কিরূপে?

এই নির্বোধেরা এতটুকু বুঝে না যে, উটও আরবী বুজিতে পারে না; কিন্তু উট চালকের আরবী পল্লী -গীতির সুমধুর তানে তন্ময় হইয়া হর্ষোল্লাসে ভারী বোঝা লইয়া অতি দ্রুত গতিতে পথ চলিতে চলিতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াই ইহার তন্ময়তা কাটিয়া যায়, তৎক্ষণাৎ ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাইয়া ফেলে। উপরিউক্ত নির্বোধ গর্দভদের এই উটের সহিত এইরূপ ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক করা উচিতঃ তুই তো আরবী ভাষা মোটেই বুঝিতে পারিস না। এমতাবস্থায় আরবী কবিতা শ্রবণ করিয়া তোর আনন্দ ও স্ফূর্তি কেমন করিয়া জন্মিল?

সম্ভবত এক বুযুর্গ সুফী مَازَارَنِىْ فِىْ النَّوْمِ اِلاَّ خِيَالُكُمْ

আমার নিদ্রিতাবস্থায় তোমাদের কল্পনা ব্যতীত অপর কেহই আমার সহিত সাক্ষাত করে নাই।

আরবী কবিতা উহার অর্থের বিপরীত কোন অর্থ বুঝিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার কল্পনা অনুযায়ী ইহার অর্থ বুঝিয়া লইয়াছিলেন। কারণ, কবিতার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। এই কবিতা শ্রবণমাত্র উক্ত সুফী মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি আরবী ভাষা জানিতেন না। মজলিসের লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ এই কবিতায় কি বলা হইয়াছে তাহাতো আপনি বুঝেন নাই। এমতাবস্থায় আপনার মূর্ছা হইল কিরূপে? সূফী উত্তর করিলেন ঃ কেন বুঝি নাই ? গায়ক বলিলেন ঃ مارايم অর্থাৎ আমরা নিরাশ্রয় ও অক্ষম। গায়ক যথার্থই বলিয়াছেন। বাস্তব পক্ষে আমরা সকলেই নিরাশ্রয়, অভাবগ্রস্ত ও বিপদজ্জনক অবস্থায় নিপতিত।

ফলকথা, সমা' শ্রবণে এ সমস্ত বুযর্গের মূর্ছার কারণ এই যে, যাঁহার অন্তরে যে ভাব প্রবল থাকে, তিনি যাহাই শ্রবণ করেন না কেন, তাঁহার অন্তরস্থ সেই ভাবের কথাই শুনিয়া থাকেন এবং যাহা কিছু দর্শন করেন, তাঁহার অন্তরস্থ কল্পনার সেই বস্তুই দর্শন করিয়া থাকেন। আল্লাহ্‌র প্রেম অথবা অপর কোন পার্থিব প্রেমে বিদগ্ধ না হইলে এই বিষয়টি কেহই উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

চতুর্থ কারণ ঃ সমা' শ্রোতা যুবক হইলে ও তাহার কামভাব প্রবল থাকিলে এবং আল্লাহ্‌র মহব্বত যে কি বস্তু, তাহা তাহার জানা না থাকিলে ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, যখন সে কৃষ্ণবরণ কেশগুচ্ছ, মুখমণ্ডলের তিলকবিন্দু ও অনুপম রূপচ্ছটার বিবরণ শ্রবণ করিবে তখন শয়তান তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিবে, তাহার কাম-প্রবৃত্তিকে সতেজ করিতে থাকিবে এবং সুন্দরী কামিনীদের রূপনেশাকে তাহার অন্তরে সুন্দর সাজে সাজাইয়া উপস্থিত করিবে। এমতাবস্থায় অন্যান্য প্রেমাসক্ত লোকের প্রেমোন্মাদনার

কাহিনী শ্রবণ করিতে তাহার খুব ভাল লাগিবে। সুতরাং প্রবল কামনা লইয়া সে সেই রূপসীর আহ্বনে তৎপর হইবে এবং অবশেষে আসক্তির পুঁতিগন্ধময় গলি-পথে চলিতে আরম্ভ করিবে।

এমন বহু নর-নারী বিদ্যমান যাহারা সূফীগণের ন্যায় বেশভূষা ধারণ করে; কিন্তু কামরিপুর বশীভূত হইয়া রূপের নেশায় উন্মত্ত হইয়া রূপসী রমনী ও শ্মশ্রুবিহীন সুদর্শন বালকদের পিছে পিছে ঘুরিয়া বেড়ায়। আবার উহার সমর্থনে অর্থহীন ওযর উপস্থাপিত করে; অথচ এই ওযর স্বয়ং গুনাহ হইতে অধিকতর মন্দ। তাহারা বলে ঃ অমুকের অন্তরে প্রেম ও আসক্তির বীজ উপ্ত হইয়াছে এবং অমুক ব্যক্তির হৃদয়ে প্রেমের কন্টক বিদ্ধ হইয়াছে। তাহারা আরও বলেঃ প্রেম আল্লাহ্‌র একটি ফাঁদ। আল্লাহ্‌র অমুক ব্যক্তিকে এই ফাঁদে ফাঁসাইয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। তাহারা বলে ঃ প্রেমাসক্ত ব্যক্তির মন রক্ষা করা এবং প্রেমাস্পদের সহিত যাহাতে তাহার মিলন ঘটে ইহার চেষ্টা করা উত্তম কার্য। তাহারা বারবণিতালয়ের দালালিকে সৎপথ প্রদর্শন এবং ব্যভিচার ও ছোকরাবাজীকে প্রেম ও আসক্তি নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তাহারা আবার নিজেদের দোষ স্খালনের উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকে ঃ অমুক পীর সাহেব অমুক ছোকরার প্রেমে আসক্ত ছিলেন এবং আবহমানকাল হইতেই বুযর্গগণের চরিত্রে এই প্রকার আসক্তি পরিলক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। সুদর্শন বালকদের সহিত কুকর্মে লিপ্ত হওয়াকে তাহারা ছোকরাবাজী বলে না; ইহাকে তাহারা বলে চক্ষুর তৃপ্তি সাধন মাত্র এবং মনমুগ্ধকর রূপরাশি দর্শন করাকে তাহারা আত্মার খোরাক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকে। এইরূপ মিথ্যা, বাজে ও অশ্লীল কথা সত্যের আকারে সাজাইয়া তাহারা নিজেদের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করে। এই প্রকার জঘন্য কার্যকে যাহারা পাপ বলিয়া বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে ইবাহতি বলে (যাহারা হারামকে হালাল বলে, তাহাদিগকে ইবাহতি বলা হয়) তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলাই বিধেয়।

এই মরদূদগণ যে বলিয়া থাকে অমুক অমুক পীর অমুক অমুক বালকের প্রতি আসক্ত ছিলেন, ইহার কতিপয় কারণ থাকিতে পারে।

১. হয়ত তাহারা নিজেদের দোষ ঢাকিবার জন্য এইরূপ মিথ্যা উক্তি করিয়া থাকে বা কোন পীর হয়ত কোন বালকের প্রতি প্রীতির চক্ষে দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন এবং সে দৃষ্টিতে কামভাব ছিল না, যেমন লোকে লাল সেব ফল ও অফুটন্ত কলির সৌন্দর্য দর্শন করিয়া থাকে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, সেই পীর কর্তৃক তদ্রূপ ভুল হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, সকল পীর নিষ্পাপ নহেন। কোন পীর কর্তৃক কোন ভুল বা পাপ সংঘটিত হইলেই সেই পাপ নির্দোষ হইয়া পড়ে না। আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের (আ) কাহিনী এইজন্য বর্ণনা করিয়াছেন, যেন তুমি বুঝিতে পার যে, বুযর্গ হইলেও কেহই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ হইতে নিরাপদ নহে। হযরত

দাউদ (আ) বিলাপ ও তওবার কথাও আল্লাহ্ পাক এই জন্যই বর্ণনা করিয়াছেন যেন প্রমাণ গ্রহণ করিতে পার যে, হযরত দাউদ (আ)-এর ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ নবী যখন রোদন ও তওবা করিয়াছেন তুমি কখনো পাপ হইতে নিরাপদ নহ। অতএব, তোমারও তওবা ও রোদন করা আবশ্যক।

২. সুন্দর বালকের প্রতি কোন কোন পীরের প্রীতির চক্ষে দর্শনের আরও একটি কারণ আছে; ইহা নিতান্ত বিরল। সূফীগণের যে সমস্ত অবস্থা প্রকাশ পায় তন্মধ্যে কোন কোন অবস্থা অদৃশ্য জগতের নানাবিধ বস্তু তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সম্ভবত ফেরেশতাগণের মৌলিক আকৃতি ও আম্বিয়া (আ)-এর পবিত্রাত্মা কোনও আকার ধারণপূর্বক আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই আত্মপ্রকাশ অতীব মনোরম ও সুন্দর আকৃতি ধারণ করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ সুন্দর আকৃতি ধারণ করিবার কারণ এই যে, বাহ্যরূপ অবশ্যই আসল পদার্থের অনুরূপ হইয়া থাকে। যেহেতু এ -স্থলে আসল বস্তুটি আত্মিক জগতের, কাজেই তাহা নিতান্ত পূর্ণ। সুতরাং সেই পূর্ণ মনোরম ও পরম সুন্দর বস্তুটির প্রতিচ্ছবিও নিতান্ত সুন্দর ও মনোরম হইবে। সেকালে আরবদেশে দহিয়া কালবী (রা) অপেক্ষা অধিক সুন্দর অপর কেহই ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ) কে তাঁহার আকৃতিতে দেখিতে পাইতেন।

সম্ভবত ঃ আধ্যাত্মিক জগতের কোন বস্তু কোন সুদর্শণ বালকের আকৃতিতে কোন সুফীর নয়নগোচর হয়। এই আকৃতি আধ্যাত্মিক জগতের কোন বস্তুর বহিঃপ্রকাশমাত্র এবং দৃশ্যটির দর্শন লাভ পুনরায় উক্ত সূফীর ভাগ্যে নাও ঘটিতে পারে। সুতরাং উক্ত মনোরম আকৃতির সদৃশ্য সমাকৃতির কোন সুন্দর আকৃতি সেই সূফীর দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হারানো স্বর্গীয় অবস্থাটি এই সুন্দর আকৃতি দর্শনে তাঁহার হৃদয় আবার সতেজ হইয়া উঠে। ফলে তিনি যেন সেই হারানো অবস্থা পুনরায় লাভ করিয়া থাকেন। উক্ত সুন্দর আকৃতিটি দর্শনে সূফীর মনে ভাবোন্নত্ততার উৎপত্তি হয়। এমতাবস্থায় আধ্যাত্মিক জগতের সেই পবিত্র অবস্থা ফিরিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে কোন সূফী কোন বালকের প্রতি প্রীতির চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা অসঙ্গত হইবে না

অতএব, যে ব্যক্তি এই গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত নহে, কোন খাঁটি সূফী ব্যক্তিকে সুন্দর আকৃতি দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট দেখিয়া সে ইহাই মনে করিবে যে, এই সূফী ব্যক্তি ঐ অজ্ঞ ও মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় কামভাব লইয়াই সুদর্শন আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কারণ, এই অজ্ঞ লোকটি তো সেই আধ্যাত্মিক জগতের পবিত্র ভাব ও অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে।

মোটকথা, সূফীগণের কার্য অতি শ্রেষ্ঠ, বিপদসঙ্কুল এবং নিতান্ত রহস্যপূর্ণ। তাঁহাদের কার্যকলাপে যত ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে অন্য কাহারো কার্যে তত

ভুলভ্রান্তি হওয়ার আশঙ্কা নাই। লোকে যেন জানিতে পারে যে, এই সূফীগণ অজ্ঞ জনসাধারণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইতেছেন ইহা এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য। কারণ, আজকাল যে ভণ্ড সূফীর দল সাধুর বেশ ধারণপূর্বক শয়তানের ন্যায় মানব -সমাজে ভণ্ডামি করিয়া বেড়াইতেছে, অজ্ঞ জনসাধারণ এই সত্যিকার সূফীগণকেও তাহাদের দলভুক্ত বলিয়া মনে করে। বাস্তব পক্ষে তাহারাই উৎপীড়িত যাহারা সুফীগণের প্রতি এইরূপ হীন ধারণা পোষণ করে। কারণ খাঁটি সূফীকে ভণ্ডদের ন্যায় মনে করিয়া তাহারা নিজেদের উপরই অত্যাচার করিতেছে।

পঞ্চম কারণ ঃ সর্বসাধারণ লোক অভ্যাশবশত আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে যে সমা' করিয়া থাকে তাহাকে, পেশারূপে গ্রহণ না করিলে এবং সর্বদা না করিলে উহা মুবাহ। কোন কোন ক্ষুদ্র পাপ কার্য পেশারূপে গ্রহণ করিলে যেমন উহা মহাপাপে পরিণত হয়, তদ্রূপ কোন কোন বস্তু সময় সময় অল্পমাত্রায় হইলে মুবাহ্‌র মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় হইলেই ইহা হারাম হইয়া পড়ে। হাবশী বালকগণ মাত্র একবার মসজিদে সাময়িক কুচকাওয়াজ করিয়াছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে নিষেধ করেন নাই। কিন্তু তাহারা মসজিদকে অনুষ্ঠানাগাররূপে গ্রহণ করিলে রাসুলুল্লাহ্ (সা) অবশ্যই তাহাদিগকে নিষেধ করিতেন। আর মাত্র একবার হওয়ার দরুণই হযরত আয়েশা (রা)-কেও উহা দর্শন করিতে তিনি নিষেধ করেন নাই। কিন্তু কেহ যদি ক্রীড়ামোদীদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায় কিংবা উহাকে পেশারূপে গ্রহণ করে, তবে উহা কখনই জায়েয নহে। সময় সময় হাস্য-কৌতুক করা দুরস্ত আছে। কিন্তু অভ্যাসে পরিণত করিয়া লইলে তাহা বিদ্রুপ বলিয়া গণ্য হইবে এবং দুরস্ত হইবে না।

দ্বিতীয় অননুচ্ছেদ

সমা'র নিয়ম ও প্রভাব ঃ সমা'র তিনটি ধাপ আছে। যথা ঃ উপলব্ধি, মূর্ছা ও অঙ্গ-বিক্ষেপ। ইহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

প্রথম ধাপ ঃ সমা'র উপলব্ধি। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়নায়, পার্থিব মোহে মুগ্ধ হইয়া বা কেবল মানবের রূপের নেশায় মত্ত হইয়া সমা' শ্রবণ করে, সে এইরূপ কলুষিত ও নিকৃষ্ট যে তাহার উপলব্ধি ও মানসিক অবস্থা আলোচনাযোগ্য নহে। কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে ধর্ম-ভাব ও আল্লাহ্‌র মহব্বত প্রবল, তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী ঃ মুরীদগণ। কারণ, আল্লাহ্‌র পথ অন্বেষণ ও সেই পথে চলার সময় তাহাদের হৃদয়ের বিমর্ষতা ও উৎফুল্লতা, সারল্য ও কঠিন এবং গৃহীত হওয়ার ও প্রত্যাখ্যানের নির্দশনাবলী ইত্যাদি অবস্থা হইতে তাহাদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার অবস্থা

প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে ধর্ম-পথযাত্রীর মন সম্পূর্ণরূপে জড়িত থাকে। এমতাবস্থায় তিরস্কার ও গ্রহণ, মিলন ও বিচ্ছেদ, নৈকট্য ও দূরত্ব, সন্তোষ ও বিরক্তি, আশা ও নিরাশা, ভয় ও নিরাপত্তার, অঙ্গীকার পালন ও অঙ্গীকার ভঙ্গন এবং মিলন -সুখ ও বিচ্ছেদ -যাতনা, এইরূপ কোন কথা যদি তিনি শুনতে পান অথবা এই প্রকার অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা থাকে, তবে তিনি উহাকে নিজের মানসিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া লন। আর ইহাতে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাব প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং বিভিন্ন প্রকার আনুষঙ্গিক অবস্থা তাঁহার হৃদয়ে উৎপন্ন হয় ও সেই অবস্থাসমূহের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে নানারূপ কল্পনা জাগরিত হয়। মুরীদের জ্ঞান- বিশ্বাসের ধারা সুদৃঢ় না থাকিলে সমা' শ্রবণে তাঁহার মনে এমন কল্পনা আসিতে পারে যাহা কুফরী। যেমন, সমা' শ্রবণ করতঃ আল্লাহ্‌র গুণ সম্বন্ধে এমন কল্পনা উদিত হইতে পারে যাহা তাঁহার সম্বন্ধে একেবারে অসম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন কেহ এই কবিতা শ্রবণ করে ঃ

زاول ظنت میل بوال حیل کجاست ه وامرو زملول لشتن
ازبیر حیراست–

ইতিপূর্বে আমার প্রতি তোমার যে অনুরাগ ছিল তাহা আজ কোথায় ? কিজন্য তুমি আজ আমার প্রতি বিরাগ ?

যে মুরীদ সাধনার পথে প্রথম প্রথম খুব দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে ছিল; এখন গতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছে; উক্ত কবিতা শ্রবণে জ্ঞানের অপরিপক্কতাহেতু সে মুরীদ মনে করিতে পারে যে, প্রথমদিকে আল্লাহ্ তাহার প্রতি অতি অনুগ্রহশীল ছিলেন এবং তাহার সহিত আল্লাহর সংযোগ ছিল প্রগাঢ়, কিন্তু এখন তাঁহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আল্লাহ্‌র শানে এইরূপ পরিবর্তন মনে করা কুফরী। বরং তাহার বুঝা উচিত যে, আল্লাহ্‌তে কোন পরিবর্তন একেবারে অসম্ভব। কারণ তিনি পরিবর্তনকারী, পরিবর্তনশীল নহেন। মুরীদের ইহাই বুঝা উচিত যে, তাহার নিজের মধ্যেই পবিবর্তন ঘটিয়াছে। তাহার হৃদয়ের যে অবস্থা ইতিপূর্বে উন্মুক্ত ছিল, যাহাতে আল্লাহর করুণা তাহার হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিত এখন তাহার হৃদয়ের সেই পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আল্লাহ্ পাকের দিক হইতে কোন প্রতিবন্ধকতা, পর্দা ও বিরাগ কখনই হয় নাই; বরং তাহার অসীম রহমতের দ্বার চির অবারিত। যেমন, সূর্য; ইহা সকলকেই কিরণ দান করিতেছে কিন্তু যে ব্যক্তি প্রাচীরের আড়ালে গমন করে, সে নিজেই সূর্যের কিরণ হইতে আড়ালে পড়িয়া যায়। সেই সময় লোকটির মধ্যেই পরিবর্তন ঘটে, সূর্য কিরণে কোন পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং তাহাকে বলা উচিত ঃ

خو اثبر محب امراے رگاری دمیرا است ه بر بنره اگرن
تابرا زاد بیر است–

চাহিয়া দেখ, সূর্য উদিত হইয়াছে। ইহার আলোকে দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে। কিন্তু কোন বান্দার উপর যদি এই কিরণ রশ্মি পতিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, সূর্যের কোন দোষ নাই, দুর্ভাগ্য তাহারই।

অতএব মুরীদের পথে কোন পর্দা বা বাধা পড়িলে বুঝিতে হইবে ইহা তাহার নিজের দুর্ভাগ্য ও ত্রুটির কারণেই হইয়াছে। আল্লাহ্‌র দিক হইতে উহা আরোপিত হইয়াছে বলা সঙ্গত নহে। উক্ত উপমার উদ্দেশ্য এই যে, ধর্ম-পথযাত্রীর চলার পথে যে সমস্ত ত্রুটি -বিচ্যুতি ও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, উহাকে নিজের পক্ষ হইতেই ঘটিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। অপর পক্ষে তাহার অন্তরে যে সৌন্দর্য ও অসাধারণ গুণ পরিলক্ষিত হয় এবং যে অসীম দান সে লাভ করে, উহা আল্লাহ্‌প্রদত্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। যে মুরীদের এতটুকু বুঝিবার মত জ্ঞান নাই, সে অতি সত্বর কুফরের বিপদে নিপতিত হইবে; অথচ ইহা সে জানিতেও পারিবে না। এইজন্যই আল্লাহর মহব্বতে সমা' শ্রবণে আপদ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ এই শ্রেণীর সমা' শ্রবণকারী মুরীদের শ্রেণী অতিক্রম করত ঃ আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্ন হালাত (অবস্থা) ও মকামাত (ধাপ) পার হইয়া এমন অবস্থার শেষপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন যাহাকে আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় পদার্থের সহিত সম্বন্ধ করিলে উহাকে 'ফানা' ও 'নাস্তির' অবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হয়। আর আল্লাহ্ পাকের সহিত সম্বন্ধ করিলে ইহাকে তাওহীদ ও অন্তরঙ্গতার অবস্থা বলা যায়। এইরূপ ব্যক্তি অর্থ বুঝিবার উদ্দেশ্যে 'সমা' শ্রবণ করেন না; বরং সমা' শ্রবণমাত্রই তাঁহাদের অন্তরে নাস্তি ও অন্তরঙ্গতার অবস্থা সতেজ হইয়া উঠে। তাঁহারা এখন আত্মহারা হইয়া বাহ্যজগত সম্বন্ধে একেবারে অচেতন হইয়া পড়েন। উপমাস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা অগ্নিতে পতিত হইলেও কিছুই টের পান না। যেমন, একদা হযরত শায়খ আবুল হাসান নূরী (র) মূর্ছিতাবস্থায় সদ্য কর্তিত ইক্ষু ক্ষেতের উপর দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ ইক্ষু-মূলগুলি দ্বারা তাঁহার পদদ্বয় কাটিয়া গিয়া একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িল। কিন্তু ইহা তিনি বিন্দুমাত্রও টের পাইলেন না। এই শ্রেণীর মূর্ছা (ওয়াজদ) অতি পরিপূর্ণ ও উন্নতস্তরের হইয়া থাকে। কিন্তু মুরীদগণের মূর্ছার সময় একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়েন। যেমন, হযরত ইউসুফ (আ) মূর্ছায় মানবসুলভ গুণাবলী লোপ পায় না। পক্ষান্তরে এই শ্রেণীর সূফীগণ রূপ দর্শনে মহিলাগণ এমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা নিজদিগকে ভুলিয়া গিয়া নিজ নিজ হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল।

এই আত্মহারা অবস্থাকে কখনও অবিশ্বাস করিও না। এবং এইরূপও বলিও না আমি তাহাকে তো দিব্যি দেখিতে পাইতেছি, সুতরাং তাহার সত্তা কিরূপে বিলুপ্ত

হইল? কারণ, তুমি এখন তাহার যে দেহটি দেখিতেছ, উহা সে নহে। এই ব্যক্তি মরিয়া গেলেও তো তুমি তাহার দেহটি দেখিতে পাও। কিন্তু সে উহাতে থাকে না। মানুষের সত্তা একটি অতিসূক্ষ্ম বস্তু। ইহা সমস্ত অনুভূতি ও জ্ঞানের আধার। যখন সকল পদার্থ সেই সূক্ষ্ম বস্তুর জ্ঞান ও অনুভূতি হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন বাস্তবে সমস্ত পদার্থই তাহার নিকট বিলুপ্ত। আর মূর্ছিত অবস্থায় যখন নিজেকেও ভুলিয়া যায়, তখন নিজের সত্তার নিকট সে নিজেও বিলুপ্ত (নিস্ত) হইয়া যায়। তাহার ধ্যান-পটে কেবল আল্লাহ্‌পাক ও তাঁহার স্মরণ ব্যতীত যখন আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না তখন সমস্ত নশ্বর বস্তুই তাহার নিকট বিলুপ্ত হয় এবং একমাত্র চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর আল্লাহ্ পাকই তাহার ধ্যান-পটে অবশিষ্ট থাকেন। তাওহীদের অর্থ ইহাই যে, মানুষ যখন স্বীয় ধ্যান-পটে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন বস্তুই দেখিতে পায় না, তখন সে বলে সমস্তই তিনি, আমার অস্তিত্বই নাই। অথবা সে বলে, আমি নিজেই তিনি। একদল এখানে মহা ভুল করিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা এই বিলুপ্তকে দ্রবণ (হুলুল) বলিয়া অভিহত করিয়াছেন। অপর একদল উহাকে মিলন (ইত্তিহাদ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বিষয়টি এইরূপ, যে ব্যক্তি কখনও দর্পণ দেখে নাই, সে দর্পণে দৃষ্টি করিয়া যখন নিজের প্রতিমূর্তি দেখিতে পাইবে তখন সে মনে করিবে, সে স্বয়ং দর্পণে নামিয়া আসিয়াছে অথবা মনে করিবে, সেই প্রতিমূর্তিই দর্পণের আকৃতি। কারণ, দর্পণের ধর্ম এই যে, ইহা রক্তিম ও শুভ্র বর্ণ ধারণ করিতে পারে। যদি মনে করে যে, সে নিজেই দর্পণে নামিয়া আসিয়াছে, তবে ইহা দ্রবণ (হুলুল) হইবে এবং বুঝে যে, স্বয়ং দর্পণই দর্শনকারীর প্রতিমূর্তি ধারণ করিয়াছে, তবে উহা মিলন (ইত্তিহাদ) হইবে। দর্পণ সম্বন্ধে এই উভয়বিধ মতই ভুল। কারণ, দর্পণ কখনও প্রতিমূর্তি হয় না এবং প্রতিমূর্তিও কখনই দর্পণে পরিণত হয় না। কিন্তু দর্শনকারীর দৃষ্টিতে এইরূপই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং যাহার কার্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান নাই, সে এইরূপ মনে করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নহে। ইহ্‌য়াউল উলুম গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ অর্থ-বোধের পর ভাবোন্মত্ততা (হাল) জন্মে। ইহাকে মূর্ছা বা সংজ্ঞা বিলুপ্তি (ওয়াজ্‌দ) বলে। ওয়াজদ (وجد) শব্দের অর্থ প্রাপ্ত হওয়া। সুতরাং যে মানসিক অবস্থা পূর্বে ছিল না তাহা লাভ করাকেই ওয়াজ্‌দ বলে। ওয়াজদের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। ওয়াজদ কি? যথার্থ কথা এই যে, ইহা এক প্রকার নহে; বরং বিবিধ প্রকারে ইহা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রধানত ঃ দুই প্রকার বস্তু হইতেই ইহা হইয়া থাকে। প্রথম, অন্তরে উদ্ভব অবস্থা হইতে এবং দ্বিতীয়, অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত বস্তু হইতে।

প্রথম প্রকার ওয়াজদ ঃ মানসিক অবস্থার কোন একটি প্রবল হইয়া মানুষকে উন্মত্তের ন্যায় করিয়া ফেলিলেই এই শ্রেণীর ওয়াজদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই অবস্থা কখনও হয় আসক্তি, কখনও বা ভয়, কখনও বা প্রেমানল, কখনও যাচঞা, কখনও দুঃখ, কখনও আবার আক্ষেপ হইয়া থাকে। উহা বহু প্রকার হইয়া থাকে। কিন্তু তন্মধ্যে কোন একটি ভাব অন্তরে আগুন জ্বালাইয়া দিলে উহার ধূম্ররাশি মস্তিষ্কে প্রবেশ করত ঃ ইহার ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহকে বিকল করিয়া দেয়। তখন নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় সে দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না। যদিও বা দেখিতে ও শুনিতে পায়, উন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় সেই দর্শন ও শ্রবণের প্রতি সে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত ও উদাসীন থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজদ ঃ ইহা অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত বস্তু হইতে জন্মিয়া থাকে। যে সমস্ত অদৃশ্য বস্তু সূফীগণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে তন্মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য বস্তুর আকৃতিতে এবং কতকগুলি অবিকল আকৃতিতে তাঁহারা দেখিতে পান। ইহাতে সমা'র প্রভাব এই জন্য যে, ইহা হৃদয়কে পরিষ্কার করে। হৃদয়পট ধূলিমিশ্রিত দর্পণের ন্যায় ঘোলাটে হইয়া থাকে। সমা' এই ধূলিরাশি হইতে হৃদয়কে পরিষ্কার করে, যাহাতে নানাবিধ প্রতিচ্ছবি ইহাতে প্রতিফলিত হয়। এই অবস্থা সম্পর্কে যতটুকু প্রকাশ করা যায় তাহা একটি জ্ঞান বা অনুমান কিংবা সাদৃশ্য। আর যে ব্যক্তি এই স্তরে উপনীত হইয়াছেন তিনি ব্যতীত অপর কেহই ইহার মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। আবার যিনি যতটুকু পৌঁছিয়াছেন তিনি ততটুকু জানিতে পারেন। যিনি যতটুকু পৌঁছিয়াছেন তিনি ততটকুই অপরের উপর প্রতিফলিত করিতে পারেন। যাহা কিছু অনুমান করা যায় তাহা পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে, যওক (আস্বাদন শক্তি) দ্বারা হয় না। এ সম্বন্ধে এতটুকু বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা এই স্তরে উপনীত হয় নাই তাহারাও যেন উপরিউক্ত অবস্থার প্রতিবিশ্বাস স্থাপন করে এবং অবিশ্বাস না করে। কারণ, অবিশ্বাস করিলে নিজেদের ক্ষতি হইবে। যে ব্যক্তি মনে করে যে, তাহার নিজের ভাণ্ডারে যাহা নাই তাহা বাদশাহগণের ভাণ্ডারেও নাই, সে বড় নির্বোধ।

আবার যে ব্যক্তি সামান্য কৃষিকার্য দ্বারা যৎসামান্য শস্যলাভ করিয়া মনে করে, আমি বড় বাদশাহ, আমি সমস্ত মর্যাদাই প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সব কিছুই আমার অর্জিত হইয়াছে ও আমার নিকট যাহা নাই তাহার অস্তিত্বই নাই, সে পূর্ববর্ণিত ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক নির্বোধ। এই দুই শ্রেণীর নির্বোধেই সুফীগণের অসাধারণ কার্যাবলী অবিশ্বাস ও অস্বীকার করিয়া থাকে।

কেহ কেহ আবার মূর্ছার ভান করিয়া থাকে। ইহা নিছক ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু মূর্ছার উপকরণসমূহ হৃদয়ে আনয়ন করিবে, যেন সত্যিকারের মূর্ছা জন্মে। হাদীস শরীফে আছে, কুরআন শরীফ শ্রবণের সময় তোমরা রোদন কর। রোদন না আসিলে রোদনের ভান কর। ইহার অর্থ এই, চেষ্টা করিয়া দুঃখ-শোকের উপকরণ অন্তরে আনয়ন করিলে হয়ত প্রকৃত দুঃখ-শোকের উপকরণ অন্তরে জন্মিবে।

প্রশ্ন ঃ সমা' শ্রবণ যদি সূফীগণের পক্ষে হিতকর এবং আল্লাহ্পাকের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে তবে সূফীগণের মজলিসে গায়কদিগকে সমা' গাহিবার জন্য না বসাইয়া মিষ্টস্বরে কুরআন শরীফ পড়িবার জন্য তাহাদিগকে বসাইয়া দেওয়াই উচিত। কারণ, কুরআন শরীফ আল্লাহ্র পবিত্র বাণী; ইহা শ্রবণ করাই উত্তম।

উত্তর ঃ কুরআন শরীফের পবিত্র আয়াত শ্রবণের জন্য বহু মজলিসের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে এবং উহাতে বহু লোকের সংজ্ঞা লোপ পাইয়া থাকে। কুরআন শরীফ শ্রবণে বেহুঁশ হইয়া পড়েন এমন অনেক লোক আছেন। এমন কি, বহু লোক কুরআন শরীফ শ্রবণে বেহুঁশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহিনী বর্ণনা করিলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। ইহ্য়াউল উলুম গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। কিন্তু সূফীগণ সমা'র মজলিসে কুরআন শরীফ পাঠকদিগকে না বসাইয়া গযল-গায়কদিগকে বসাইবার এবং কুরআন শরীফ শ্রবণ না করিয়া তৎপরিবর্তে সমা' শ্রবণ করিবার পাঁচটি কারণ রহিয়াছে।

প্রথম কারণ ঃ কুরআন শরীফের সকল আয়াত আল্লাহ্- প্রেমিকদের অবস্থার সহিত সম্পর্ক রাখে নাই। কারণ, কুরআন শরীফে কাফিরদের কাহিনী, পার্থিব কাজ-কারবারের বিধি-নিষেধ এবং নানাবিধ বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে। কেননা, কুরআন শরীফও সর্বপ্রকার সৃষ্ট জীবনের মুক্তির জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে; সুতরাং পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধীয় আয়াত যখন পাঠ করা হইবে এবং উহাতে বর্ণিত থাকিবে যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ পাইবে মাতা এবং অর্ধাংশ পাইবে ভগ্নি। আবার কোন আয়াতে উল্লেখ থাকিবে যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীকে চারিমাস দশদিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে, প্রভৃতি। এই প্রকার আয়াতসমূহ প্রত্যেক প্রেমিকের প্রেমানল বৃদ্ধি করিবে না। এই শ্রেণীর আয়াত শ্রবণে কেবল তাঁহাদের প্রেমানলই বৃদ্ধি করিবে যাঁহাদের প্রেম অসীম এবং সুললিত কণ্ঠনিঃসৃত যে কোন সুমিষ্ট স্বর শ্রবণেই যাঁহারা মূর্ছিত হইয়া পড়েন; যদিও শ্রুত বিষয় তাঁহাদের উদ্দেশ্যের সহিত কোনই সম্পর্ক রাখে না। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রেমিক অতি বিরল।

দ্বিতীয় কারণ ঃ অনেক লোক কুরআন শরীফের হাফেয ও সুদক্ষ ক্বারী। সুতরাং প্রত্যহ কুরআন শরীফের বহু তিলাওয়াত শুনা যায়। আর যাহা বহুবার শ্রুত হয় তাহা অনেক সময় হৃদয়কে ভাবোন্মত্ত করিতে পারে না। এমন কি, কোন কিছু প্রথমবার শুনিলে যে অবস্থা হয়, দ্বিতীয়বার শুনিলে তদ্রূপ হয় না। সমা' নূতন নূতন হইতে পারে; কিন্তু কুরআন শরীফ নূতন হইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যখন আরববাসিগণ তাঁহার পবিত্র দরবারে উপস্থিত হইয়া কুরআন শরীফের নূতন নূতন আয়াত শ্রবণ করিতেন তখন তাঁহারা রোদন করিতেন এবং তাঁহারা তন্ময় হইয়া যাইতেন।

হযরত আবূবকর (রা) বলেন ঃ

كُنَّا كَمَا كُنْتُمْ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُنَا–

আমরা তোমার মত ছিলাম। অতঃপর আমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

অর্থাৎ প্রথম প্রথম কুরআন শরীফ শ্রবণে তোমাদের ন্যায় আমাদের মনও বিগলিত হইয়া যাইত, এখন আর তদ্রূপ হয় না। এখন আমাদের মন শান্ত ও স্থির এবং কুরআন শরীফ শ্রবণ অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে জিনিস সদ্য টাটকা ও নূতন ইহার প্রভাবও অধিক হইয়া থাকে। এইজন্যই হযরত উমর (রা) হাজিগণকে শীঘ্র নিজ নিজ শহরে ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দিতেন এবং বলিতেন ঃ আমার আশঙ্কা হয় যে, ক্বাবা শরীফ দর্শনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে ইহার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাহাদের অন্তর হইতে বিদূরীত হইয়া যাইবে।

তৃতীয় কারণ ঃ এমন লোক অনেক আছে যাহাদের অন্তরকে সুমিষ্ট সুর ও ছন্দযুক্ত স্বরে আন্দোলিত না করিলে উহা সক্রিয় হইয়া উঠে না। এইজন্যই সোজাসুজি কথায় মূর্ছা কম আসিয়া থাকে এবং তান-লয়যুক্ত সুমধুর সুরেই মূর্ছা আসিয়া থাকে। অধিকন্তু সুললিত কণ্ঠনিঃসৃত সমা'র প্রতিটি রাগিনী ও পদ্ধতির স্বতন্ত্র প্রভাব রহিয়াছে। অথচ তান-লয় যোগপূর্বক সমা'র ন্যায় কুরআন শরীফ পাঠ করা দুরস্ত নহে আবার কুরআন শরীফ গানের সুরে পাঠ না করিলে উহা চলিত কথার মতই হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রেও আল্লাহ্প্রেম অত্যন্ত প্রবল থাকিলে কুরআন শরীফ চলিত কথার মত পাঠ করিলেও প্রেমানল উত্তেজিত হইয়া উঠে।

চতুর্থ কারণ ঃ সুমিষ্ট স্বরকে অন্যান্য মধুর সুর দ্বারা সাহায্য করিলে উহার প্রভাব অধিক হইয়া থাকে; যেমন, দফ-শাহীনের সুর কণ্ঠস্বরের সহিত মিলিত হইলে ইহার প্রভাব আরও বর্ধিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রসমূহ খেল-তামাশার অন্তর্ভুক্ত। অপর পক্ষে

কুরআন শরীফ মূল ইবাদত। সুতরাং ইহাকে খেল-তামাশার আবিল্য হইতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখা একান্ত কর্তব্য এবং যাহা জনসাধারণের দৃষ্টিতে খেল-তামাশার অন্তর্ভুক্ত, তৎসমন্বয়ে কুরআন শরীফ পাঠ করিয়া উহাকে খেল-তামাশার রূপ দেওয়া কখনই দুরস্ত নহে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা মুআওয়াযের কন্যা রুবাইয়ের গৃহে গমন করিলেন। তখন তাহাদের দাসিগণ দফ বাজাইয়া কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল। হুযূর (সা)-কে দেখিবামাত্র তাহারা কবিতায় তাঁহার প্রশংসাবাদ গাহিতে আরম্ভ করিল। হুযূর (সা) তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বলিলেন ঃ চুপ কর এবং যাহা পূর্বে আবৃত্তি করিতেছিলে তাহাই আবৃত্তি কর। ইহার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসাবাদ মূলত ঃ ইবাদত। সুতরাং বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে এমন মহান কার্যের অনুষ্ঠান দুরস্ত নহে।

পঞ্চম কারণ ঃ বিভিন্ন লোকের মানসিক অবস্থা বিভিন্নরূপে হইয়া থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজ অবস্থা অনুযায়ী সমা' শ্রবণে অভিলাষী হয়। যে কবিতা শ্রোতার মানসিক অবস্থায় নহে তাহা শুনিতে তাহার ভাল লাগে না। তখন হয়ত সে বলিয়া বসিতে পারে ঃ ইহা আবৃত্তি করিও না; অপর কোন কবিতা বল। শ্রোতার মনে বিরক্তি জন্মে, এমন স্থানে কুরআন শরীফ পাঠ করা উচিত নহে। কুরআন শরীফের সকল আয়াত প্রত্যেকের মানসিক অবস্থার অনুকূলে না-ও হইতে পারে। কবিতার মর্ম শ্রোতার মানসিক অবস্থার অনুকূল না হইলেও সে উহাকে নিজের অবস্থার সহিত মিলাইয়া লইতে পারে। কারণ, কবি যে মর্মে কবিতা রচনা করিয়াছেন, শ্রোতার জন্য উহা ইহতে অবিকল সেই মর্ম গ্রহণ করা ওয়াজিব নহে। পক্ষান্তরে শ্রোতার জন্য কুরআন শরীফের অর্থকে নিজের অবস্থা ও ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তন করিয়া লওয়া দুরস্ত নহে।

এই সমস্ত কারণে সূফীগণ তাঁহাদের মজলিসে ক্বারীর পরিবর্তে গযল-গায়কদিগকে মনোনীত করিয়া থাকেন। উপরিউক্ত পঞ্চবিধ কারণের সারমর্ম দুইটি মাত্র। (১) শ্রোতার মানসিক দুর্বলতা ও ত্রুটি -বিচ্যুতি এবং (২) কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব। কাজেই ইহাকে নিজের খেয়াল অনুযায়ী ব্যবহার করা যাইবে না।

তৃতীয় ধাপ ঃ অঙ্গ-বিক্ষেপ, নর্তন ও বস্ত্র ছেঁড়া। যে ব্যক্তি ভাবোন্নত্ততায় আত্ম সংবরণে অক্ষম ও ইচ্ছাশক্তির বহির্ভূত হইয়া এই সমস্ত কার্য করে, তজ্জন্য সে দণ্ডনীয় হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এ সমস্ত কার্য এই উদ্দেশ্যে করে যে, লোকে উহা দেখিয়া তাহাকে সূফী বলিয়া মনে করিবে অথচ প্রকৃতপক্ষে সে সূফী নহে, তার এইরূপ আচরণ হারাম ও নিছক ভণ্ডামি।

হযরত আবুল কাসেম নাসিরাবাদী (র) বলেন ঃ আমার মতে গীবতে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা আল্লাহর মহব্বতবর্ধক সমা' শ্রবণে ব্যাপৃত থাকা উৎকৃষ্ট। হযরত আবু আমর ইব্‌ন নজীদ (র) বলেন ঃ সমা' শ্রবণে মিথ্যা ভাবোন্মত্ততার ভান করা অপেক্ষা ত্রিশ বৎসর গীবত (অগোচরে পরনিন্দা) করা উৎকৃষ্ট।

যে ব্যক্তি সমা' শ্রবণ করেন; অথচ অটল ও শান্ত থাকেন এবং তাঁহার আভ্যন্তরীণ অবস্থার কোন প্রকার পরিবর্তন বাহিরে প্রকাশ পায় না, তিনিই অধিকতর কামিল সুফী। তাঁহার মানসিক শক্তি এত অধিক যে, তিনি নিজকে রক্ষা করিতে পারেন। পক্ষান্তরে যাহারা দুর্বল, তাহারাই অঙ্গবিক্ষেপ, চিৎকার ও রোদন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ মনোবল অতি বিরল। হযরত আবূ বকর (রা) বলিয়াছেন যে, كُنَّا كَمَا كُنْتُمْ قَسَتْ قُلُوْبُنَا ইহার অর্থও সম্ভবত ইহাই যে, قَوِيَتْ قُلُوْبُنَا অর্থাৎ আমাদের অবস্থাও প্রথম প্রথম দুর্বল ছিল; তখন আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন বাহিরে প্রকাশ প্রতিরোধ করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমাদের মনোবল এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে ব্যক্তি মানসিক পরিবর্তন বাহিরে প্রকাশ প্রতিরোধ করিতে অক্ষম, প্রয়োজনের শেষ সীমায় না পৌঁছা পর্যন্ত নিজেকে দমন করিয়া রাখা এবং নিজের অবস্থা প্রকাশ পাইতে না দেওয়া তাহার কর্তব্য।

এক যুবক হযরত জুনায়দ (র)-এর দরবারে উপস্থিত হইতেন। সমা'র আওয়ায শ্রবণে এই ব্যক্তি চিৎকার করিয়া উঠিতেন। হযরত জুনায়দ (র) তাঁহাকে বলিলেন ঃ পুনরায় এইরূপ করিলে আমার সংসর্গে অবস্থান করিও না। অতঃপর সেই যুবক ধৈর্যধারণপূর্বক স্বীয় হৃদয়ের সমা' শ্রবণজনিত আবেগ দমন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। একদা সর্বশক্তি প্রয়োগে হৃদয়ের আবেগ দমন করিলেন এবং নিজকে সামলাইয়া লইলেন। কিন্তু অবশেষে এক বিকট চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ফলে তাঁহার পেট ফাটিয়া গেল এবং তিনি ইন্তিকাল করিলেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি নিজ হইতে মানসিক অবস্থা প্রকাশ না করে এবং অনিচ্ছায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নর্তন-কুর্দনে প্রবৃত্ত হয় অথবা চেষ্টা করিয়া নিজের মধ্যে রোদনের ভান আনয়ন করে, তবে দূষণীয় নহে। কারণ, হাবশী বালকেরা মস্‌জিদে কুচকাওয়াজ করিয়াছিল এবং হযরত আয়েশা (রা) ইহা দর্শনের জন্য গমন করিয়াছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলেন ঃ তুমি আমা হইতে ও আমি তোমা হইতে। এই শুভবাণী শুনিয়া হযরত আলী (রা) আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় পবিত্র পদদ্বারা কয়েকবার ভূমিতে আঘাত করিলেন। আরববাসিগণ আনন্দের অতিশয্যে এইরূপ করিতে অভ্যস্ত ছিল। হুযূর (সা) হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) কে বলিলেন ঃ আকৃতি ও স্বভাবে তুমি আমার ন্যায়। ইহা শুনিয়া তিনিও আনন্দে নাচিয়া

উঠিলেন। হুযূর (সা) হযরত যায়দ ইব্‌নে হারিসা (রা) কে বলিলেন ঃ তুমি আমার বন্ধু এবং ভ্রাতা। তিনিও আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। যে নৃত্য এইরূপ সাময়িক আনন্দাতিশয্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র তাহা হারাম নহে। যদি কেহ স্বীয় হৃদয়স্তিত আল্লাহ্ প্রেমের ভাবকে দৃঢ় করার চেষ্টা করিতে গিয়া নৃত্য করিয়া উঠে তবে ইহা দোষের নহে; বরং প্রশংসনীয়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক সজ্ঞানে পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন করা উচিত নহে। ইহা করিলে অর্থের অপচয় হয়। কিন্তু সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বস্ত্র ছিন্ন করিলে অবৈধ নহে, যদিও স্বেচ্ছায় হউক না কেন। কারণ, এইরূপ অবস্থায় সে হয়ত বস্ত্র ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে এবং ছিন্ন করিতে না চাহিলেও নিবৃত্ত থাকিতে পারে না-সে এমন রোগীর ন্যায় যে রোগের তাড়নায় ইচ্ছা করিয়াই রোদন ও চিৎকার করিয়া থাকে। কিন্তু সে রোদন ও চিৎকার দমন করিতে ইচ্ছা করিলেও উহা না করিয়া পারে না। মানুষ স্বীয় ইচ্ছায় ও আগ্রহে যে কার্য করিয়া থাকে তাহা হইতেও সব সময় নিবৃত্ত থাকা তাহার জন্য সম্ভব হইয়া উঠে না। সুতরাং মানুষ মূর্ছিত অবস্থায় আত্ম-সংবরণে অক্ষম হইয়া এইরূপ কার্য করিলে অপরাধী হইবে না।

সুফীগণ কোন কোন সময় স্বীয় পরিধানের বস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া পার্শ্ববর্তী লোকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া থাকেন। একদল লোক ইহাতে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া থাকে-এইরূপ করা উচিত নহে। এইরূপ প্রতিবাদকারী নিজেই ভুলে রহিয়াছে। কারণ, পিরহান প্রস্তুত করিবার জন্যও তো বস্ত্র টুকরা টুকরা করা হইয়া থাকে। বস্ত্র নষ্ট না করিয়া কোন কাজের উদ্দেশ্যে খণ্ড খণ্ড করা অবৈধ নহে। এইরূপে যদি বস্ত্রের টুকরাগুলি নিজের পার্শ্ববর্তী লোকদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় যেন প্রত্যেকেই উহার কিছু কিছু অংশ প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ জায়নামায ও জুব্বার সহিত সেলাই করিয়া লইতে পারে, তবে তাহাও দুরস্ত আছে। কারণ, কেহ যদি একখানা নেকড়াকে চারিশত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক-একটি খণ্ড এক-একজন দরিদ্রকে দান করে এবং প্রত্যেকটি খণ্ড কাজের উপযোগী থাকে, তবে তাহাও অবৈধ হইবে না।

সমা'র নিয়ম

সমা' শ্রবণের সময় তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য; যথা ঃ সময়, স্থান এবং মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ।

সময় ঃ নামাযের সময় উপস্থিত হইলে, আহারের সময় অথবা অপর কোন কারণে মন অস্থির থাকিলে সমা' শ্রবণ নিষ্ফল হইবে।

স্থান ঃ সর্বসাধারণের চলাচলের পথে, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও মন্দ স্থানে কিংবা কোন অত্যাচারী লোকের বাড়িতে সমা' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলে শ্রোতৃমণ্ডলীর মন অস্থির ও চঞ্চল থাকে।

মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ ঃ সমা'র মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে অহংকারী, দুনিয়াদার অথবা সমা'তে অবিশ্বাসী কিংবা ভানকারী, যে মিথ্যা ভান করিয়া মূর্ছিত হয় ও নৃত্য করে, কিংবা ধর্ম-কর্মে উদাসীন লোক থাকে যাহারা কুপ্রবৃত্তির খেয়ালে সমা' শ্রবণ করে, অথবা বেহুদা কথা বলে ও এদিক সেদিক তাকায়। মজলিসের মর্যাদা নষ্ট করে : অথবা সভায় যুবক শ্রোতা থাকে ও কামিণিগণও তামাশা দেখিবার জন্য উপস্থিত হয় এবং এমতাবস্থায় যুবক-যুবতিগণ একে অন্যের ধ্যানে থাকে। এইরূপ মজলিসে সমা' শ্রবণ নিষ্ফল।

এই মর্মেই হযরত জুনায়দ (র) বলেন, সমা'র জন্য অনুকূল সময়, স্থান ও উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ শর্ত। আর যে স্থানে যুবতী কামিণিগণ তামাশা দেখিবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয় এবং ধর্মে-কর্মে উদাসীন ও কামান্ধ যুবকের দল বিদ্যমান থাকে, তথায় সমা'র অনুষ্ঠান করা হারাম; কারণ, এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের কামাগ্নি প্রজ্বলিত করিবে এবং তাহারা প্রত্যেকে পরস্পরের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করিবে। ফলে হয়ত একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে এবং পরিশেষে ইহা নানাবিধ পাপ ও বিবাদ-বিসম্বাদের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপ সমা'র অনুষ্ঠান কখনও উচিত নহে।

সমা'র মজলিসে পালনীয় নিয়ম ঃ নিজ নিজ মস্তক সকলেই অবনত রাখিবে এবং কেহই কাহারও প্রতি তাকাইবে না। সমা' শ্রবণে প্রত্যেকেই নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন রাখিবে এবং মাঝে কখনও কথা বলিবে না, পানি পান করিবে না এবং এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করিবে না। হাত ও মাথা নাড়িবে না এবং ইচ্ছাপূর্বক ভান করিয়া কোন প্রকার অঙ্গ বিক্ষেপ করিবে না; বরং নামাযে 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠের সময় যেরূপ বসিতে হয় তদ্রূপ আদবের সহিত বসিবে এবং স্বীয় হৃদয়কে আল্লাহ্‌র সঙ্গে রাখিবে। আর অন্তরে অদৃশ্য জগতের কি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, ইহার প্রতীক্ষায় থাকিবে এবং নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে যেন স্বেচ্ছায় দণ্ডায়মান না হও, নর্তন-কুর্দন ও অঙ্গ-বিক্ষেপ আরম্ভ না কর। ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া কেহ দণ্ডায়মান হইয়া পড়িলে তাহার সহিত সকলেই দাঁড়াইবে। এমতাবাস্থায় কাহারও পাগড়ী পড়িয়া গেলে সকলেই পাগড়ী খুলিয়া ফেলিবে। এই সমস্ত কার্য বিদ'আত (নব প্রবর্তিত) এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন (রা) এইরূপ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ না থাকিলেও বিদ'আতমাত্রই বর্জনীয় নহে। কারণ, অনেক বিদ'আত এমন আছে যাহা পূন্যের কার্য। হযরত ইমাম শাফিঈ (র) বলেন যে, তারাবীহের নামাযে জামায়াত হযরত উমর (রা) কর্তৃক উদ্ভাবিত ও নির্ধারিত এবং ইহা উৎকৃষ্ট বিদ্‌আত। নিন্দনীয় ও মন্দ বিদ'আত কেবল তাহাই, যাহা

সুন্নতের খেলাফ। কিন্তু সকলের সহিত সদ্ব্যবহার এবং মানুষের মনে আনন্দ প্রদান শরীয়াতে প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট কার্য। প্রত্যেক জাতির রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। তাহাদের সহিত তাহাদের আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণ করা অশিষ্টতা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

خَالِقِ النَّاسِ بِاَخْلاَقِهِمْ-

মানুষের সহিত তাহাদের আচার ব্যবহার অনুযায়ী ব্যবহার কর।

সুফীগণের কার্য-কলাপের অনুকরণ করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অন্যথায় তাঁহারা মনঃক্ষুণ্ন হন। কাজেই তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া চলাও শিষ্টাচার বটে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনে তাঁহার সম্মানার্থে সাহাবায়ে কিরাম (রা) দণ্ডায়মান হইতেন না, কারণ তিনি ইহা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু যে স্থানে সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হওয়ার রীতি প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং দণ্ডায়মান না হইলে লোকে মনঃক্ষুণ্ন ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, সে স্থানে তাহাদের মন সন্তুষ্ট করিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া উত্তম। কারণ, শিষ্টাচার প্রদর্শনের রীতি আরবদেশে একরূপ এবং অন্য দেশে অন্যরূপ। প্রকৃত ব্যাপারে আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন।

নবম অধ্যায়
সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ

সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ ধর্মের মূল বিষয়সমূহের অন্যতম। আল্লাহ্ সকল নবী-রাসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করিয়াছেন। এই মূল বিষয় বিলুপ্ত ও মানব -সমাজ হইতে উঠিয়া গেলে শরীয়তের সমস্ত বিধি-নিষেধ রহিত হইয়া যাইবে। আমি এই বিষয় তিনটি অনুচ্ছেদে বর্ণনা করিব।

প্রথম অনুচ্ছেদ

সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ ওয়াজিব ঃ সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব। উপযুক্ত সময়ে যে ব্যক্তি বিনাকারণে উহা বর্জন করে, সে পাপী হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

তোমাদের মধ্যে একদল লোকের পেশাই এই হওয়া উচিত যে, তাহারা লোকদিগকে মঙ্গলের দিকে আহ্বান করিবে এবং নেককার্যে আদেশ করিবে ও পাপকার্যে প্রতিরোধ করিবে।

এই আয়াত হইতে জানা যায় যে, এই কার্য ফরয। কিন্তু ইহা ফরযে কিফায়া। কিছু সংখ্যক লোক এই কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইলেই যথেষ্ট। কিছুসংখ্যক লোকেও ইহা না করিলে সকল মানুষই পাপী হইবে। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ-

তাঁহাদিগকে আমি জগতে প্রভুত্ব প্রদান করিলে তাহারা নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে এবং নেক কার্যে আদেশ করিবে ও পাপ কার্য প্রতিরোধ করিবে।

এই আয়াতে সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধকে আল্লাহ্ তা'আলা নামায ও যাকাতের সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে দীনদার লোকগণের প্রশংসা করিয়াছেন।

হাদীসের সতর্কবাণী ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা নেক কার্যে আদেশ করিতে থাক। অন্যথায় তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতর ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তোমাদের উপর চাপাইয়া দিবেন। তখন তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্টতর ব্যক্তির দু'আও আল্লাহ্ কবূল করিবেন না।

হযরত আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে কওমের মধ্যে পাপ হইতে থাকে এবং লোকে ইহা নিবারণ করে না, আল্লাহ্ সেখানে অচিরেই আযাব নাযিল করিয়া থাকেন যাহাতে সকলে নিপতিত হয়। তিনি বলেন ঃ জিহাদের তুলনায় তোমাদের সমুদয় নেককার্য মহাসমুদ্রে একবিন্দু পানি সদৃশ এবং সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধের তুলনায় জিহাদ মহাসমুদ্রে একবিন্দু পানিসদৃশ। তিনি বলেন ঃ মানুষ যত প্রকার কথা বলে তন্মধ্যে সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ এবং আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্য সমস্তই তাহার অনিষ্ট করিয়া থাকে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র খাস বান্দাগণের মধ্যে নিষ্পাপ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা জনসাধারণের দরুন শাস্তি দিবেন না। কিন্তু এইরূপ ব্যক্তিগণ যখন মন্দকার্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখেন এবং বারণ করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও নীরব থাকেন (প্রতিরোধ করেন না), তখন তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।

তিনি বলেন ঃ যে স্থানে অত্যাচারপূর্বক লোকে কাহাকেও বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে অথবা মারপিট করিতেছে, সেখানে দাঁড়াইও না। কারণ যে ব্যক্তি (অত্যাচার) দর্শন করে এবং প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিরোধ করে না, তাহার উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। তিনি বলেন ঃ যে স্থানে অন্যায় আচরণ হয়, সেখানে উপবেশন করা এবং প্রতিকার না করা দুরস্ত নহে। কারণ, এইরূপ প্রতিকার তাহার আয়ু ও জীবিকা কমাইবে না। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, অত্যাচারীদের গৃহে অথবা যে স্থানে শরীয়ত বিরুদ্ধ অন্যায় কার্য অনুষ্ঠিত হয়, অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে বিনাকারণে তথায় যাওয়া দুরস্ত নহে। এইজন্যই প্রাচীনকালে বুযর্গগণ বাজার ও রাস্তাঘাট অন্যায় ও অত্যাচারমুক্ত নহে বলিয়া নির্জনবাস অবলম্বন করিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কাহারও সম্মুখে যদি কোন পাপ অনুষ্ঠিত হয় এবং সে তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হয় তবে যেন সে তথায় উপস্থিতই ছিল না ও তাহার অনুপস্থিতিতে সেই পাপ অনুষ্ঠিত হইল। আর সে যদি সেই পাপ কার্যে সন্তুষ্ট থাকে তবে যেন তাহার

সম্মুখে পাপ কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক রাসূলেরই হাওয়ারী (আসহাব) ছিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহারা আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নত অনুসারে কার্য করিতেন। তাঁহাদের পর এমন লোক জন্মগ্রহণ করে যাহারা মিম্বারে আরোহণ করিয়া তো সুন্দর সুন্দর উপদেশ প্রদান করে কিন্তু (নিজেরা) মন্দ কার্য করিয়া থাকে। তাহাদের সহিত জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর কর্তব্য ও ফরয। হাতে জিহাদ করিতে না পারিলে রসনা দ্বারাই করিবে, রসনা দ্বারা করিতে না পারিলে অন্তর দ্বারাই করিবে (অর্থাৎ সে পাপকে অন্তরে ঘৃণা করিবে)। ইহা হইতে কম হইলে ঈমান থাকিবে না।

হুযূর (সা) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এক ফেরেশতাকে আদেশ দিলেন ঃ অমুক বস্তি উলটাইয়া দাও। ফেরেশতা নিবেদন করিল ঃ ইয়া আল্লাহ্! সে স্থানে অমুক ব্যক্তি রহিয়াছেন। তিনি কখনই এক নিমেষের জন্যও কোন পাপ করেন নাই। কিরূপে সেই বস্তি উলটাইয়া দিব? আদেশ হইল ঃ তুমি তা উলটাইয়া দাও। কারণ, অপরের পাপানুষ্ঠান দেখিয়া সে কখনও তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় নাই।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, এক শহরের অধিবাসীদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা আযাব প্রেরণ করেন। তাহাদের মধ্যে আঠার হাজার লোক এমন ছিল যাহাদের আমল পয়গম্বরগণের ন্যায় ছিল। লোকে নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! কেন তবে তাহাদের উপর আযাব আসিল? হুযূর (সা) বলেন, এই কারণে যে, (পাপ কার্য করিতে দেখিয়া) আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাহারা অপরের উপর ক্রুদ্ধ হইত না ও তাহাদিগকে বারণ করিত না। হযরত আবূ উবায়দাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, লোকে রাসূলাল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ (সা)! শহীদগণ হইতে উৎকৃষ্ট কোন্ ব্যক্তি? হুযূর (সা) উত্তরে বলিলেন যে, স্বেচ্ছাচারী বাদশাহের অন্যায় আচরণ দেখিয়া যে ব্যক্তি ইহার প্রতিবাদ ও প্রতিকার করে, এমন কি শেষ পর্যন্ত ইহাতে নিহত হয়, সে ব্যক্তি (শহীদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট); নিহত না হইলেও (তাহার পাপ লিপিবদ্ধ করিতে) কলম চলিবে না যদিও সে দীর্ঘজীবী হউক।

হাদীস শরীফে উক্তি আছে, হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র হযরত ইউশা (আ)-এর উপর আল্লাহ্ তা'আলা ওহী অবতীর্ণ করিলেন ঃ তোমার কওমের একলক্ষ লোক আমি ধ্বংস করিয়া ফেলিব; তন্মধ্যে চল্লিশ হাজার নেককার ও ষাট হাজার বদকার। তিনি নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! নেককারদিগকে কেন ধ্বংস করিবেন? উত্তর আসিল ঃ এইজন্য যে, তাহারা অপরের (পাপীদের) সহিত শত্রুতা পোষণ করে নাই; তাহাদের সহিত পানাহার, উঠা-বসা ও আদান-প্রদানে বিরত থাকে নাই।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

অসৎকর্মে প্রতিরোধের শর্ত ঃ পাপের প্রতিরোধ ও প্রতিকার সকল মুসলমানের উপরই ফরয। অতএব, উহার জ্ঞানার্জন ও শর্তাবলী অবগত হওয়াও ওয়াজিব। কারণ, যে কর্তব্যকর্মের শর্তাবলী জানা থাকে না তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করাও সম্ভব হয় না। প্রতিরোধ কার্য চারটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যথা ঃ (১) প্রতিরোধকারী, (২) সেই পাপ যাহা প্রতিরোধ করিতে হইবে, (৩) সেই ব্যক্তি যাহার পাপ প্রতিরোধ করিতে হইবে এবং (৪) প্রতিরোধ পদ্ধতি।

প্রথম বিষয়; প্রতিরোধকারী ঃ প্রাপ্তবয়স্ক বোধমান মুসলমান হওয়াই ইহার একমাত্র শর্ত। কারণ, পাপ প্রতিরোধ করা ধর্ম কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব। অতএব, যে ব্যক্তি ধর্মীয় গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত সেই পাপ প্রতিরোধের উপযোগী। প্রতিরোধকারী নিষ্পাপ ও বাদশাহের পক্ষ হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক কিনা, এ সম্বন্ধে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের মতে ইহা শর্ত নহে। কারণ, পাপ নিবারণকারী নিষ্পাপ হওয়া কিরূপে শর্ত হইবে? কেননা, কেবল নিষ্পাপ ব্যক্তিই পাপ নিবারণ কার্যের একমাত্র উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে পাপকার্যে প্রতিরোধ কখনও হইতে পারে না। কারণ, কেহই নিষ্পাপ নহে।

হযরত সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (রা) বলেন ঃ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ হওয়ার পর পাপে প্রতিরোধ করিলে প্রতিরোধের কোন উপায়ই দৃষ্টিগোচর হইবে না। হযরত হাসান বসরী (র)-র নিকট লোকে বলিল যে, এক ব্যক্তি বলিতেছে ঃ নিজকে সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত করিয়া না লওয়া পর্যন্ত অপরকে পাপকার্য হইতে বারণ করা উচিত নহে। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ শয়তান তাহাকে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছে যেন পাপ নিবারণের পথই রুদ্ধ হইয়া পড়ে।

এ সম্পর্কে যথার্থ কথা ও সুবিচার এই যে, পাপ নিবারণ দুই উপায়ে হইয়া থাকে। প্রথম, উপদেশ প্রদান ও বক্তৃতা দ্বারা। ইহার অবস্থা এই, যে ব্যক্তি নিজেই পাপকার্য করিয়া বেড়ায়, সে যদি অপরকে উপদেশ প্রদান করিয়া বলে ঃ এই কার্য করিও না; তবে এইরূপ উপদেশে নিজকে হাস্যাস্পদ করা ব্যতীত আর কিছুই ফল হইবে না। এইরূপ উপদেশ অপরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিবে না। প্রকাশ্যে পাপাচারী ফাসিক যেন এইরূপ উপদেশ প্রদান না করে। বরং সে যদি বুঝে যে, লোকে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিবে না, অধিকন্তু তাহাকে উপহাস করিবে, এমতাবস্থায় অপরকে উপদেশ দিলে সে নিজেই পাপী হইবে। কারণ, ফাসিক লোকের ধর্মোপদেশে মানুষের মন হইতে ওয়ায-নসীহতের মাধুর্য ও শরীয়তের মর্যাদা বিদূরীত হয়। এইজন্যই প্রকাশ্যে পাপাচারী আলিমের ওয়াযে লোকের ক্ষতি হইয়া থাকে এবং এইরূপ আলিমও পাপী হইয়া থাকে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মি'রাজের

রাত্রে একদল লোককে দেখিলাম যাহাদের ওষ্ঠ আগুনের কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ তোমরা কে? তাহারা বলিল ঃ আমরা অপরকে সৎকর্মের আদেশ করিতাম অথচ আমরা নিজে তাহা করিতাম না। অপরকে মন্দকার্য হইতে বারণ করিতাম; কিন্তু আমরা নিজে সেই কাজ হইতে বিরত থাকিতাম না।

হযরত ঈসা (আ)-এর উপর আল্লাহ্ ওহী অবতীর্ণ করিলেন ঃ হে মরিয়মের পুত্র! প্রথমে নিজকে উপদেশ প্রদান কর। তুমি নিজে উপদেশ মানিয়া চলিলে অপরকে উপদেশ দাও। অন্যথায় আমার নিকট লজ্জিত থাক।

পাপকার্য প্রতিরোধের দ্বিতীয় পন্থা হইল হাতে ও বল-প্রয়োগে পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখা। যেমন, কোথাও মদ দেখামাত্র ফেলিয়া দেওয়া, বীণা, বেহালা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সুর শ্রবণমাত্র উহা কাড়িয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা: কেহ ঝগড়া-বিবাদ করিতে উদ্যত হইলে বল-প্রয়োগে তাহাকে নিবৃত্ত করা। এই শ্রেণীর মন্দকার্যের নিষেধ ফাসিক ব্যক্তিও করিতে পারে। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দুইটি কার্য ওয়াজিব। যথাঃ (১) নিজে মন্দ কাজ না করা এবং (২) অপরকে মন্দ কাজ করিতে না দেওয়া। ইহাদের একটি পালনে ত্রুটি হইলে অপরটি পালনেও ত্রুটি করার কি কারণ থাকিতে পারে?

এ স্থলে কেহ যদি প্রতিবাদ করিয়া বলে, যে ব্যক্তি নিজে রেশমী বস্ত্র পরিধান করে, সে অন্য লোককে এই পোশাক পরিধান করিতে নিষেধ করিয়া তাহার দেহ হইতে রেশমী বস্ত্র ছিনাইয়া লওয়া অথবা নিজে মদ পানে অভ্যস্ত থাকিয়া অপর লোককে উহাতে বাধা প্রদানপূর্বক তাহার হস্ত হইতে মদের পাত্র কাড়িয়া লইয়া ঢালিয়া ফেলা মন্দ ও অশোভন, তবে তাহার উত্তরে এই মন্দকার্য ও মূলত ঃ শরীয়ত বিরুদ্ধ কার্য, এক কথা নহে। অপরকে রেশমী বস্ত্র পরিধান ও মদ্যপানে বাধা প্রধান মূলত ঃ শরীয়ত বিরুদ্ধ কার্য নহে। অপরকে রেশমী বস্ত্র পরিধান ও মধ্যপানে বাধা প্রদান মূলতঃ শরীয়ত বিরুদ্ধ কার্য নহে। তবে এ ক্ষেত্রে সে নিজেও এই সকল মন্দকার্য হইতে বিরত না থাকিয়া নিজ কর্তব্যে অবহেলা করার দরুন অপরকে নিষেধ করায় মন্দ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; মূলত ঃ শরীয়ত বিরুদ্ধ ও মন্দ কার্য বলিয়া নহে। কাজেই স্বয়ং পাপ হইতে বিরত না থাকিয়াও অপরকে পাপকার্যে বাধা প্রদান করা মন্দ ও অশোভন হইতে পারে না। কারণ, কোন ব্যক্তি যদি রোযা রাখে অথচ নামায পড়ে না, তবে তাহার রোযা রাখাকে এইজন্য মন্দ বলিয়া বিবেচনা করা হয় যে, সে রোযা রাখিতেছ অথচ নামাযের ন্যায় একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক ইবাদত সে ত্যাগ করিতেছে। রোযা রাখা মূলত ঃ শরীয়ত বিরোধী কাজ বলিয়া তাহার রোযা রাখা মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; বরং এইজন্যই যে, নামায অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং সে ইহা ত্যাগ করিতেছে। এইরূপে স্বয়ং শরীয়তের

নির্দেশ পালন করাও অপরকে উপদেশ প্রদান অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক। কিন্তু উভয় কাজই ওয়াজিব। একটি অপরটির শর্ত নহে যে, একটি পালন না করিলে অপরটিও বর্জন করিতে হইবে। একটি অপরটির শর্ত হইলে ব্যাপার এইরূপ হইয়া দাঁড়াইত যে, কাহাকেও মদ্যপানে বাধা প্রদান করা তখনই ওয়াজিব যখন বাধা প্রদানকারী স্বয়ং মদ্যপান করে না; কিন্তু সে যখন নিজে মদ্যপান করিল তখন মদ্যপানে অপরকে বাধাপ্রদান করার ওয়াজিবের দায়িত্ব হইতে সে অব্যাহতি পাইল। অথচ ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পাপ কার্য দমনের জন্য বাদশাহের পক্ষ হইতে অনুমতি ও নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়াও শর্ত নহে। এইজন্যই প্রাচীন বুযর্গগণ স্বয়ং বাদশাহ ও খলীফাগণকে পাপানুষ্ঠান হইতে বারণ করিতেন। ইহার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। পাপ প্রতিরোধের স্তরসমূহ অবগত হইলেই ইহার জন্য বাদশাহের অনুমতি ও নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া শর্ত কিনা, যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে।

পাপ প্রতিরোধের চারিটি স্তরঃ প্রথম স্তর ঃ উপদেশ প্রদান ও আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করা। ইহা সকল মুসলমানের উপরই ওয়াজিব। ইহাতে বাদশাহের অনুমতির কি প্রয়োজন? বরং বাদশাহকে উপদেশ প্রদান এবং আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করা বড় ইবাদত।

দ্বিতীয় স্তর ঃ পাপাচারীকে তিরস্কার করা ও তৎপ্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা যথাঃ হে ফাসিক, হে অত্যাচারী, ওরে নির্বোধ, ওহে মূর্খ, তোদের কি আল্লাহ্‌র ভয় নাই যে এমন পাপ কার্য করিতেছিস? ফাসিক সম্বন্ধে এ সমস্ত কথাই সত্য। সত্য কথা বলিতে বাদশাহের অনুমতির কি প্রয়োজন?

তৃতীয় স্তর ঃ বল প্রয়োগে বারণ করা। যেমন, মদ্য ঢালিয়া ফেলা, বাদ্য-যন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলা, কাহারও মাথা হইতে রেশমী পাগড়ী টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া। এই সমস্ত কার্য ইবাদতের ন্যায়ই ওয়াজিব। প্রথম অনুচ্ছেদে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাদশাহের বিনা অনুমতিতেই শরীয়ত প্রত্যেক মুসলমানকে পাপ কার্য নিবারণের অনুমতি প্রদান করিয়াছে।

চতুর্থ স্তর ঃ মারিয়া-পিটিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া। এমতাবস্থায় পাপাচারী হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইতে পারে এবং প্রতিরোধকারীও স্বীয় বলবৃদ্ধির জন্য নিজের দলের লোকদিগকে একত্রিত করিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে পারে। বাদশাহের অনুমতি না লইয়া মারিয়া-পিটিয়া বল প্রয়োগে পাপ নিবারণ করিতে গেলে এইরূপে ভীষণ বিবাদ -বিসম্বাদ বাধিয়া যাইতে পারে। সুতরাং বাদশাহের অনুমতি ব্যতীত এই পদ্ধতিতে পাপ নিবারণে প্রবৃত্ত না হওয়াই উত্তম।

ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই যে, পাপ নিবারণের উপরিউক্ত স্তরগুলি পরিবর্তিত হইতে পারে। যেমন, পুত্র পিতাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলে নম্রতা ও

ধীরতার সহিত উপদেশ দেওয়া উচিত। নির্বোধ, মুর্খ ইত্যাদি কটুবাক্য প্রয়োগ করতঃ পিতাকে নিজের প্রতি রুষ্ট করিয়া তোলা অবশ্যই অসঙ্গত। পিতা কাফির হইলেও তাহাকে হত্যা করা এবং পুত্র জল্লাদের পদে নিযুক্ত থাকিলেও রাষ্ট্র কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত পিতাকে বধ করা পুত্রের জন্য সঙ্গত নহে কিন্তু পিতার মদ ফেলিয়া দেওয়া, তাহার পরিধান হইতে রেশমী বস্ত্র ছিনাইয়া লওয়া, পিতা কাহারও নিকট হইতে হারাম উপায়ে কিছু গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা কাড়িয়া লইয়া প্রকৃত মালিককে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া, রৌপ্যের বাসন-পত্র ব্যবহার করিতে থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা, পিতার গৃহের দেওয়ালে কোন ছবি থাকিলে তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলা এই সমস্ত কার্যে বাধা প্রদানে পুত্র সত্যপক্ষে রহিয়াছে এবং ইহাতে পিতার ক্রুদ্ধ হওয়া অন্যায়। এই সকল কার্যে পিতার ব্যক্তিত্বের প্রতি কোনরূপ অমর্যাদা প্রকাশ করা হয় না, যেমন, তাহাকে মারিলে ও গালি দিলে ব্যক্তিত্বের অমর্যাদা করা হইয়া থাকে। কেহ হয়ত বলিতে পারে যে, পিতা রুষ্ট হইলে তাহাকে পাপ হইতে বারণ করা পুত্রের উচিত নহে; যেমন হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে পুত্রের জন্য নীরব থাকা এবং উপদেশ প্রদান না করাই উচিত। পিতাকে পাপ হইতে বারণ করিতে পুত্রের যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত; ভৃত্য স্বীয় প্রভূকে, স্ত্রী আপন স্বামীকে এবং প্রজা বাদশাহকে বারণ করিতে তদ্রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। কারণ, তাহাদের সকলের হকই গুরুতর। কিন্তু শিক্ষককে পাপ কার্য হইতে বারণ করা ছাত্রের পক্ষে খুব সহজ। কেননা, ধর্মের কারণেই শিক্ষকের মর্যাদা রহিয়াছে। শিক্ষকের নিকট ছাত্র যে শিক্ষালাভ করিয়াছে এতদনুযায়ী সে আমল করিতে থাকিলে শিক্ষক বুঝিতে পারিবেন যে, স্বীয় ইলম অনুযায়ী আমল না করিলে তাঁহার মর্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ যে পাপ প্রতিরোধ করিতে হইবে ঃ যে কার্য মন্দ ও পাপী ব্যক্তির মধ্যে এখনও বিদ্যমান এবং যাহা গোপন অনুসন্ধান ব্যতীত প্রকাশ্যে জানা যায় ও মন্দ বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা আছে, উহা হইতেই প্রতিরোধ করিতে হইবে। অতএব, ইহার চারিটি শর্ত ঃ

প্রথম শর্ত ঃ কার্যটি মন্দ হওয়া। যদিও ইহা পাপের কার্য না হউক অথবা ক্ষুদ্র পাপ হউক। যেমন, উন্মাদ কিংবা নাবালেগ ব্যক্তিকে পশুর সহিত রমণ কার্যে প্রবৃত্ত দেখিলে যদিও উন্মাদ নাবালেগ হওয়ার দরুন তাহাদের পাপ ধর্তব্য নহে, তথাপি তাহাদিগকে বারণ করিতে হইবে। কারণ, কার্যটি মূলত ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে অতিশয় মন্দ। এইরূপে কোন উন্মত ব্যক্তিকে মদ্যপান করিতে দেখিলে অথবা কোন অল্প বয়স্ক বালককে কাহারও মাল নষ্ট করিতে দেখিলে নিষেধ ও দমন করিতে হইবে। পাপের

কার্য ক্ষুদ্র পাপের হইলেও অবশ্যই প্রতিরোধ করিতে হইবে। যেমন- গোসলখানায় লজ্জাস্থান অনাবৃত করা ও স্ত্রীলোকদিগকে দেখান এবং নির্জন স্থানে বেগানা স্ত্রীলোকের সহিত দাঁড়াইয়া থাকা, স্বর্ণের আংটি ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করা, রৌপ্য-পাত্রে পানি পান করা; এইরূপ সকল পাপ দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্র নিবারণ করা কর্তব্য।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ পাপ-কার্যটি তখনও বিদ্যমান থাকা। এক ব্যক্তি মদ্যপান শেষ করিয়াছে এমতাবস্থায় তাহাকে উপদেশ প্রদান ব্যতীত কোনরূপ শাস্তি দেওয়া চলে না। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া সরকারের কর্তব্য। তদ্রূপ কেহ অদ্য রাত্রে মদ্যপান করিবে বলিয়া সংকল্প করিলে তাহাকে কোন প্রকার শাস্তি না দিয়া উপদেশ দিবে। হয়ত সে ইহা হইতে বিরত থাকিতে পারে। সে পান করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলে তাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা দুরস্ত নহে। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে নির্জনে বেগানা স্ত্রীলোকের নিকটে উপবিষ্ট দেখিলে ব্যভিচার না করিয়া থাকিলেও তাহাকে শাসন করা চলে। কারণ, পরনারীর সহিত নির্জনে মিলিত হওয়াই গুরুতর পাপ। এমনকি, গোসলখানায় সমাগত নারীদিগকে দেখিবার উদ্দেশ্যে ইহার দ্বারে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকেও শাসন করা কর্তব্য। কারণ, এইরূপে দাঁড়াইয়া থাকাই পাপ।

তৃতীয় শর্ত ঃ গোপন অনুসন্ধান ব্যতীত প্রকাশ্যভাবে পাপটি জানা থাকা। অপরের পাপ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান উচিত নহে। গৃহে প্রবেশপূর্বক যে ব্যক্তি দরজা বন্ধ করিয়া ফেলে তাহার অনুমতি ব্যতীত সেই গৃহে প্রবেশ করা এবং তুমি কি করিতেছ? বলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত নহে। কাহারও দরজায় ও ছাদে কান লাগাইয়া ভিতরের শব্দ শুনিবার চেষ্টা করাও দুরস্ত নহে; বরং যে কাজ আল্লাহ্ গোপন রাখিয়াছেন তাহা গোপন রাখাই উচিত। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ও মাতালদিগের হট্টগোল বাহির হইতে শুনিতে পাইলে অনুমতি ব্যতীতই ভিতরে প্রবেশ করত ঃ উক্ত পাপকার্য প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। কোন ফাসিক ব্যক্তিকে বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া কোন জিনিস লইয়া যাইতে দেখা গেলে তাহা মদের বোতল হইলে তাহাকে 'বস্ত্র সরাও, দেখি কি আছে।' এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। এইরূপ করিলে অপরের দোষ অনুসন্ধান করা হয়। কিন্তু যদি এইরূপ সম্ভাবনা থাকে যে, তাহা মদের বোতল না হইয়া অন্য কোন কিছু হইতে পারে তবে দেখিয়াও না দেখার মত থাকিবে। কিন্তু মদের গন্ধ পাওয়া গেলে ইহা কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দেওয়া দুরস্ত আছে। মিহি বস্ত্র দ্বারা আবৃত কোন বৃহদাকার বাদ্যযন্ত্র কাহারও নিকট থাকিলে (ইহার আকৃতি যদি বাহির হইতে দেখা যায় তবে) উহা ছিনাইয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা বৈধ। কিন্তু এইরূপ

মনে করা যদি সম্ভব হয় যে, উহা অন্য কিছু হইতে পারে, তবে এমন ভাব ধারণ করিবে যেন তুমি কিছু টেরই পাও নাই।

হযরত উমর (রা)-এর এক বিখ্যাত ঘটনা এই যে, এক রাত্রে বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শুনিয়া প্রাচীর উলঙ্ঘনপূর্বক এক গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলার সহিত মদ্য পান রত আছে। ইহা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানের উদ্যত হইয়াছিলেন। 'সংসর্গ' অধ্যায় এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত উমর (রা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ বিচারক স্বীয় চক্ষে কাহাকেও মন্দ কার্য করিতে দেখিলে তিনি তাহাকে শরীয়ত-নির্ধারিত শাস্তি দিতে পারেন কিনা? কেহ কেহ মত প্রকাশ করিলেন যে, দণ্ড প্রদান করা সঙ্গত। কিন্তু হযরত আলী (রা) বলিলেন ঃ আল্লাহু তা'আলা দণ্ড প্রদানকে দুইজন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়াছেন। একজনের দর্শন যথেষ্ট হইবে না। সুতরাং হযরত আলী (রা) মতে বিচারক শুধু নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ড প্রদান করিতে পারেন না; বরং উহা গোপন রাখা বিচারকের উপর ওয়াজিব।

চতুর্থ শর্ত ঃ কার্যটি মন্দ বলিয়া নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত থাকা। অনুমান এবং ইজতিহাদ-উদ্ভাবনা দ্বারা মন্দ বলিয়া জানিলে দণ্ড প্রদান চলিবে না। হানাফী মাযহাবের লোক যখন অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে কোন মেয়ের বিবাহ দেয় কিংবা প্রতিবেশী হইতে অগ্রহ-ক্রয়ের অধিকার গ্রহণ করে অথবা এই প্রকার অপর কোন কার্য তাহাদের মাযহাবের বিধানমতে করিতে থাকে, তখন তদ্রূপ কার্যে প্রতিবাদ করা শাফিঈ মাযহাবের লোকগণের জন্য দুরস্ত নহে। কিন্তু শাফিঈ মাযহাবের কেহ অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে মেয়ে বিবাহ দিলে কিংবা নবীয (খোরমা ভিজান পঁচা পানি) পান করে, তবে তাহাকে নিষেধ করা যাইবে। কারণ, স্বীয় মাযহাবের ইমামের বিরুদ্ধাচরণ করা কাহারও মতে দুরস্ত নহে।

কোন কোন আলিম বলেন ঃ মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদি যে সমস্ত কার্য সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ও নিশ্চিতরূপে হারাম বলিয়া অবধারিত রহিয়াছে, ইজতিহাদ দ্বারা হারাম বলিয়া নির্ধারিত হয় নাই, কেবল সেই সমস্ত পাপ কার্য প্রতিরোধ করা চলে। তাঁহাদের এই উক্তি ঠিক নহে। কারণ, আলিমগণের সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, কেহ স্বীয় ইজতিহাদ কিংবা নিজ মাযহাবের ইমামের বিরুদ্ধাচরণ করিলে সে পাপী হইবে সুতরাং যাহা স্বীয় ইজতিহাদ কিংবা নিজ ইমামের বিরোধী, তাহা বাস্তবিকই হারাম। যেমন, প্রবাসে কেহ ইজতিহাদের দ্বারা কোন

একদিকেই কিবলা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়ার পর ইহার বিপরীত দিকে ফিরিয়া নামায পড়িলে সে পাপী হইবে, যদিও অপর লোক তাহাকে দেখিয়া মনে করে যে, সে ঠিক কিবলামুখী হইয়াই নামায পড়িতেছে।

লোকে যে বলিয়া থাকে, 'যাহার যে-ইমামের মাযহার মানিয়া চলিতে ইচ্ছা হয়, সে সেই মাযহাবই অবলম্বন করিতে পারে' ইহা তাহাদের বেহুদা উক্তি ও বিশ্বাসযোগ্য নহে। বরং প্রত্যেকের নিজের বিবেক অনুযায়ী কার্য করিবার নির্দেশ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার বিবেচনায় হযরত ইমাম শাফিঈ (র) উত্তম হইলে প্রবৃত্তির তাড়না ব্যতীত অন্য কোন কারণেই সে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা বলে যে, আল্লাহ্ দেহধারী, কুরআন শরীফ সৃষ্ট বস্তু, আল্লাহ্র দর্শন-লাভ অসম্ভব ও এবংবিধ বাজে প্রলাপ উক্তি করিয়া থাকে, এমন বিদ'আতীদিগকে দমন করা উচিত। কারণ, ইহা সুনিশ্চিত যে, বিদ'আতী সম্প্রদায় ভুলিয়া রহিয়াছে। মালিকী ও হানাফী মতাবলম্বী লোকদের কার্য শাফিঈ মাযহাবের বিরোধী হইলেও শাফিঈ মতাবলম্বী লোকদের পক্ষে উক্ত মাযহাবদ্বয়ের লোকদের কার্যাবলী দমন করা উচিত নহে। কেননা, ফেকাহ্শাস্ত্রে বিধানসমূহে মতভেদ হইলেও কোনটি ভুল বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। আবার বিদ'আতী সম্প্রদায়ের কার্যাবলী সেই শহরেই দমন করা চলিবে যেখানে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য এবং সুন্নত ওয়াল জামায়াতের লোকের সংখ্যা অধিক। কিন্তু কোন স্থানে বিদ'আতীর সংখ্যা যদি এত অধিক হয় যে, তুমি তাহাদিগকে দমন করিতে উদ্যত হইলে তাহারাও তোমাদিগকেও দমন করিতে সচেষ্ট হয় এবং ফলে বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়, তবে বাদশাহের অনুমতি ও ক্ষমতা ব্যতীত তাহাদিগকে দমনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।

তৃতীয় বিষয়, যাহার পাপ প্রতিরোধ করিতে হইবে ঃ ইহার শর্ত এই যে, সেই ব্যক্তি বোধসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক (মুকাল্লাফ) হইতে হইবে যেন সে কোন মন্দকার্য করিলে ইহার পাপ তাহার উপর বর্তে এবং প্রতিরোধকারীর পক্ষে সে ব্যক্তি এমন মর্যাদাসম্পন্ন না হয় যাহা শাসন-কার্যে প্রতিবন্ধক হইতে পারে, যেমন পিতা। কারণ পিতার মর্যাদা তাহাকে সতর্ক করিতে, শাসন করিতে এবং অপমানজনক ব্যবহার দ্বারা প্রতিরোধ করিতে পুত্রকে বাধা প্রদান করে। কিন্তু প্রতিরোধকারী উন্মাদ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে স্বীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী দমন করিতে পারে-যেমন পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই নিবারণ কার্যকে পাপ দমন বলা চলে না। বরং ইহা এইরূপ যে, আমরা যখন কোন পশুকে মুসলমানের শস্যক্ষেত্রে শস্য খাইতে দেখি তখন সেই মুসলমানের ধন রক্ষার্থে আমরা সেই পশুকে তাড়াইয়া দিয়া থাকি। ইহা আমাদের উপর ওয়াজিব নহে। কিন্তু

পশুটিকে তাড়াইয়া দেওয়া সহজসাধ্য হইলে এবং ইহাতে কোন ক্ষতি না হইলে ইসলামের দায়িত্ব পালনের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা আমাদের প্রতি ওয়াজিব। যেমন, কোন মুসলমানের ধন বিনষ্ট হইতেছে এবং তুমি স্বয়ং উহার সাক্ষী ও বিচারালয়ে গমনের পথও দূর নহে। এমতাবস্থায় একজন মুসলমান হিসাবে তোমার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বিচারালয়ে গমনপূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করা তোমার প্রতি ওয়াজিব নহে। কোন বোধমান ও স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তি কাহারও ধন বিনষ্ট করিলে ইহা অত্যাচার ও পাপ। কষ্ট হইলেও এইরূপ কার্য প্রতেরোধ করা ওয়াজিব। কারণ, গর্হিত কার্য ও পাপ হইতে নিজে বিরত থাকা অথবা অপরকে উহা হইতে প্রতিরোধ করা দুঃখ-কষ্ট ব্যতীত সম্ভব হয় না। অতএব, এইরূপ ক্ষেত্রে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা আবশ্যক, কিন্তু দুঃখ-কষ্ট ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে তদ্রূপ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া পাপ দমনে প্রবৃত্ত হওয়া ওয়াজিব নহে। আর পাপ নিবারণ ও শাসনের উদ্দেশ্য হইল ইসলামী রীতি-নীতি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা। এইজন্যই উহাতে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা ওয়াজিব। যেমন, যদি কোথাও হতে অধিক পরিমাণে মদ থাকে যে, উহা ঢালিয়া ফেলিতে খুব ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইতে হইবে, তবুও উহা ফেলিয়া দেওয়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কাহারও শস্যক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক ছাগল প্রবেশ করিয়া যদি শস্য নষ্ট করিতে থাকে এবং এইগুলি তাড়াইতে গেলে তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড় এবং উহাতে তোমার মূল্যবান সময়ও বিনষ্ট হয়, তবে এইরূপ কষ্ট সহ্য করা তোমার জন্য ওয়াজিব নহে। কারণ, পরের হকের ন্যায় নিজের হক রক্ষা করাও তোমার উপর ওয়াজিব। এস্থলে সময় তোমার পক্ষে। সুতরাং অপরের ধন রক্ষা করিতে যাইয়া তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করা তোমার প্রতি ওয়াজিব নহে। কিন্তু ধর্মের জন্য সময় ব্যয় ও পাপ প্রতিরোধ করা ওয়াজিব।

ক্ষমতা ও অবস্থাভেদে প্রতিরোধের ব্যবস্থা ঃ পাপ প্রতিরোধ কার্যে সর্ববিধ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা ওয়াজিব নহে। এ সম্বন্ধে ও বিস্তারিত আলোচনা দরকার। কেহ পাপ প্রতিরোধে অক্ষম হইলে সে ক্ষমাহ ও অপারগ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং এমতাবস্থায় সেই পাপের প্রতি আন্তরিক অসম্মতি ও ঘৃনাই কেবল তাহার উপর ওয়াজিব। কিন্তু তুমি যদি অক্ষম না হও অথচ এইরূপ আশংকা হয় যে, পাপ দমন করিতে গেলে পাপী তোমাকে প্রহার করিবে এবং তোমার উপদেশ নিষ্ফল হইবে, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে চতুর্বিধ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

প্রথম ঃ যদি নিশ্চিত জান যে, পাপী ব্যক্তি তোমাকে প্রহার করিবে এবং পাপ হইতে সে বিরত হইবে না, তবে প্রতিরোধ তোমার প্রতি ওয়াজিব নহে। কিন্তু মুখে

কিংবা হাতে বাধা প্রদান করা দুরস্ত আছে। পাপী তোমাকে মারধর করিলে ধৈর্য ধারণ করিবে। ইহাতে সওয়াব পাইবে। হাদীস শরীফে উক্তি আছে, যে ব্যক্তি বাদশাহকে পাপ হইতে প্রতিরোধ করিতে গিয়া নিহত হয়, তাহা অপেক্ষা কোন শহীদই উত্তম নহে।

দ্বিতীয় ঃ তুমি পাপ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ এবং ইহাতে কোন ভয়েরও কারণ নাই; পাপ প্রতিরোধে তোমার সর্ববিধ ক্ষমতা রহিয়াছে, এমতাবস্থায় প্রতিরোধ না করিলে পাপী হইবে।

তৃতীয় ঃ তুমি প্রতিরোধ করিলে মানুষ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় না এবং তাহারা তোমাকে প্রহারও করিতে পারে না, এমতাবস্থায় ধর্মের মর্যাদা রক্ষার্থে মুখে উপদেশ প্রদানপূর্বক পাপ নিবারণ তোমার উপর ওয়াজিব। কারণ, এইরূপ স্থলে পাপাচারে আন্তরিক অসম্মতি ও মনে মনে ঘৃণা যেমন দুঃসাধ্য নহে, তদ্রূপ মুখে প্রতিরোধ করাও দুঃসাধ্য নহে।

চতুর্থ ঃ তুমি পাপ দমন করিতে পার বটে; কিন্তু পাপীরা তোমাকে মারপিট করিবে। যেমন, তুমি মদ্যপাত্রে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে এবং অকস্মাৎ উহা ভাঙ্গিয়া গেল; বাদ্যযন্ত্রে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিলে এবং উহাও তদ্রূপ ভাঙ্গিয়া গেল এইরূপ ক্ষেত্রে পাপ দমনে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার প্রতি ওয়াজিব নহে। কিন্তু পাপ প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করা উত্তম কার্য।

এ স্থলে যদি কেহ বলে, আল্লাহ্ তো বলিয়াছেন যে,

لَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ–

স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তোমরা নিজকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করিও না।

তবে ইহার উত্তর এই ঃ এই আয়াতের মর্মে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ধন ব্যয় কর যাহাতে ধ্বংস না হও। হযরত বরা ইব্‌ন আযেব (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ পাপ করিয়া মনে করে যে, আল্লাহ্ তাহার তওবা কবূল করিবেন। ইহাকেই এ স্থলে নিজকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করা বলা হইয়াছে। হযরত আবূ উবায়দা (রা) এই আয়াতের মর্মে বলেন, পাপ করিয়া তৎপর কোন নেক কার্য করাই নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা।

কোন ব্যক্তি একাকী একদল কাফিরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া জায়েয আছে, যদিও সে তাহাদের হস্তে শহীদ হইয়া যায়। কারণ, এইরূপ আক্রমণে সে নিজকে নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেও ইহা নিষ্ফল নহে। ইহাতে হয়ত সেই মুসলমান ব্যক্তি অন্ততঃ একজন কাফিরকেও হত্যা করিতে

পারে। ফলে কাফিরগণের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে এবং তাহারা মনে করিতে পারে যে, সমস্ত মুসলমানই এইরূপ সাহসী হইয়া থাকে। কাফিরদের মনে এইরূপ ভীতির সঞ্চার করিতে পারিলেও বিশেষ সওয়াব পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোন অন্ধ বা খঞ্জ মুসলমানের জন্য একাকী কাফির দলের উপর আক্রমণ করা দুরস্ত নহে। কারণ, এইরূপ ক্ষেত্রে বৃথা নিজকে ধ্বংস করা হয়। এইরূপে যদি এমন ঘটনা হয় যে, পাপ প্রতিরোধ করিতে গেলে পাপীরা তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে অথবা কঠিন যন্ত্রণা দিবে, অথচ তাহারা পাপ কার্য পরিত্যাগ করিবে না; আর তুমি ধর্মব্যাপারে যে কঠোরতা অবলম্বন করিবে তাহাতে কাফিরদের মনোবল ভাঙ্গিবে না এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও সৎকর্মের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে পাপ দমনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ, নিরর্থক ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকার করাতে কি লাভ?

এই পদ্ধতিতে পাপ প্রতিরোধে দুইটি জটিলতা আছে। যথা ঃ (১) তোমার ভীতি ও নৈরাশ্য হয়ত খারাপ ধারণা ও কাপুরুষতা হইতে উদ্ভূত; (২) প্রতিপক্ষ তোমাকে মারধর করিবে এ আশংকা তোমার নাই; বরং তোমার ধন-সম্পদ ও পদ-মর্যাদা বিনষ্ট হওয়া এবং আত্মীয়-স্বজনের দুঃখ-কষ্টের আশংকা করিয়া থাক।

প্রথম ঃ জটিলতা সম্বন্ধে কথা এই যে, পাপ দমন করিতে গেলে পাপীরা তোমাকে প্রহার করিবেই, এই আশংকা যদি তোমার প্রবল হয় তবে তুমি অপারগ ও ক্ষমার্হ। কিন্তু সেই আশংকা যদি প্রবল না হয়, কেবল সম্ভাবনা থাকে মাত্র, তবে তুমি পাপ দমনে বিরত থাকিলে মার্জনীয় হইবে না। কারণ, এইরূপ সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। আর যদি পাপ দমন করিতে গেলে পাপীরা তোমাকে প্রহার করিবে কিনা, এ সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র থাকে, তবে আমাদের মতে পাপ প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হওয়া নিঃসন্দেহে ওয়াজিব এবং সন্দেহের কারণে ওয়াজিবের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। অন্য কথায় বলা যায় যে, যে ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তার ধারণা প্রবল, সে ক্ষেত্রে পাপ প্রতিরোধে অগ্রসর হওয়া ওয়াজিব।

দ্বিতীয় ঃ জটিলতা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পাপ প্রতিরোধ করিতে গেলে যদি তোমার ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, নিজদেহ, আত্মীয়-স্বজন ও শিষ্য-সেবকগণের ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকে কিংবা এইরূপ আশংকা থাকে যে, পাপীরা তোমাকে গালি দিবে অথবা তোমার কোন ধর্মীয় বা পার্থিব অনিষ্ট করিবে, তবে ইহাদের বহু প্রকারভেদ আছে এবং প্রত্যেকটির বিধানও বিভিন্ন প্রকারের হইবে। কিন্তু কেবল নিজের সম্বন্ধে আশংকা থাকিলে উহা দুই প্রকার ঃ

প্রথম প্রকার ঃ এই যে, পাপ প্রতিরোধ করিতে গেলে ভবিষ্যতে তুমি কোন স্বার্থ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। যেমন, শিক্ষককে প্রতিরোধ করিতে গেলে তিনি তোমাকে

শিক্ষাধানে বিরত থাকিবেন। সুতরাং তুমি শিক্ষালাভে বঞ্চিত থাকিবে। চিকিৎসককে প্রতিরোধ করিতে গেলে সে তোমার চিকিৎসায় শৈথিল্য প্রদর্শন করিবে, তুমি যাহার অধীনে চাকরি কর, তাহাকে প্রতিরোধ করিতে গেলে সে তোমার বেতন বন্ধ করিয়া দিবে বা প্রয়োজনের সময় সে তোমাকে সাহায্য করিবে না-এ সকল অবস্থায় পাপ প্রতিরোধে বিরত থাকিলে তুমি ইহার ওয়াজিবের দায়িত্ব হইতে রেহাই পাইবে না। কারণ, এইগুলি কোন ক্ষতি ও অনিষ্ট নহে; ভবিষ্যতে কোন প্রকার স্বার্থ হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকামাত্র। কিন্তু উপস্থিত সময়েই যদি তুমি সেই সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাক; যেমন স্বয়ং পীড়িত হইয়া পড়িয়াছ এবং চিকিৎসক রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছে। এখন তাহাকে রেশমী বস্ত্র পরিধানে বাধা প্রদান করিলে সে তোমার চিকিৎসা করিবে না; কিংবা তুমি অক্ষম ও অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছ; আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করত ঃ নীরব থাকার মত ধৈর্যও তোমার নাই এবং মাত্র একজন মানুষ তোমার ভরণ-পোষণ চালাইতেছে; তুমি তাহাকে পাপাচারে প্রতিরোধ করিলে সে তোমার ভরণ-পোষণ বন্ধ করিয়া দিবে; অথবা তুমি কোন দুরাচারের কবলে নিপতিত হইয়াছ এবং মাত্র এক ব্যক্তি তোমার সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছে; কোন পাপ হইতে এই সাহায্যকারীকে বারণ করিলে সে তোমার সাহায্যে বিরত থাকিবে-এই সমস্ত সাহায্য উপস্থিত সময়ে তোমার একান্ত প্রয়োজন। এই সকল ক্ষেত্রে পাপ দমনে প্রবৃত্ত না হইলে হয়ত আমরা তোমাকে ক্ষমার্হ ও অপারগ বলিয়া গণ্য করিতে পারি। কারণ, এ সমস্ত ক্ষেত্রে সাহায্য না পাইলে তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ ক্ষতিতে পতিত হইবে। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ সমস্ত ক্ষতির তারতম্য হইবে। ইহা তোমার ধর্মীয় বিবেচনার সহিত সংশ্লিষ্ট; ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিনা কারণে পাপ দমনে বিরত থাকিবে না।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ যে বস্তু তোমার অধিকারে রহিয়াছে তাহা তোমার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িবে। যেমন, তোমার ধন কাড়িয়া নিবে, ঘরবাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে অথবা দৈহিক শান্তি ও নিরাপত্তা হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে অর্থাৎ মারধর করিবেঃ কিংবা মারধর না করিলেও নগ্ন মস্তকে হাটে-বাজারে এবং রাস্তা-ঘাটে তোমাকে ঘুরাইয়া তোমার মান-মর্যাদার হানি ঘটাইবে, এই সব স্থানে পাপ দমনে বিরত থাকিলে তুমি অপারগ ও ক্ষমার্হ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু যদি এমন বিষয়ে তোমার আশংকা থাকে যাহাতে তোমার মনুষ্যত্বের কোন ক্ষতি হয় না; বরং তোমার শান-শওকতের লাঘব ঘটে মাত্রঃ যেমন তোমাকে নগ্নপদে বাজারের উপর দিয়া হাঁটায় এবং জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করিতে না দেয় অথবা তোমার সম্মুখে কটু ও অশ্লীল উক্তি করে, তবে এই সমস্ত ব্যাপারে মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই সকল কারণে পাপ দমনে বিরত

থাকিলে ওয়াজিবের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে না। সর্বদা গৌরবজনক চাল-চলন বজায় রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে শোভন নহে। মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া চলা অবশ্য শরীয়তের কাম্য। কিন্তু যদি এইরূপ আশংকা হয় যে, পাপ প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইলে পাপীরা তোমার নিন্দা করিবে কিংবা তোমাকে গালি দিবে, তোমার সহিত শত্রুতা পোষণ করিবে এবং কাজেকর্মে তাহারা তোমার আনুগত্য ও অনুসরণ করিবে না, তবে এই সমস্ত কখনই ওয়াজিব পরিত্যাগের উপযুক্ত কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কারণ, কোন পাপ প্রতিরোধকারীর জন্যই এই সমস্ত আপদ হইতে নিরাপদ থাকিবার উপায় নাই। কিন্তু যদি এমন আশংকা হয় যে, আগোচরে নিন্দাও করিবে এবং পাপও বৃদ্ধি পাইবে তবে পাপ প্রতিরোধ স্থগিত রাখা দুরস্ত আছে।

কিন্তু পাপ দমনে প্রবৃত্ত হইলে তোমার ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি না হইয়া বরং তোমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের তদ্রূপ ক্ষতির আশংকা করিলে; যেমন, লোকে তোমাকে সূফী বলিয়া জানে এবং তুমি অবগত আছ যে, তাহারা তোমাকে মারধর করিবে না ও তোমার এমন ধনও নাই যাহা লোকে কাড়িয়া নিয়া যাইতে পারে তবে তৎপরিবর্তে পাপীরা তোমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে উৎপীড়ন করিবে-এমতাবস্থায় পাপ দমনে প্রবৃত্ত হওয়া দুরস্ত হইবে না। কারণ, নিজের প্রতি উৎপীড়ন হইতে থাকিলে সহ্য করা সঙ্গত বটে; কিন্তু অপরের প্রতি উৎপীড়ন হইতে থাকিলে ধৈর্যধারণ করা সঙ্গত নহে। বরং যাহাতে তাহাদের প্রতি উৎপীড়ন না হয় ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা অবশ্যই ধর্মীয় কর্তব্য।

চতুর্থ বিষয়, পাপ প্রতিরোধ পদ্ধতি ঃ পাপ প্রতিরোধ পদ্ধতির পর্যায়ক্রমে আটটি স্তর আছে। যথা ঃ (১) পাপীর অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হওয়া; (২) পাপীকে তাহার পাপ সম্বন্ধে, অবহিত করা; (৩) উপদেশ প্রদান; (৪) কর্কশ বাক্য প্রয়োগ; (৫) হস্তদ্বারা তাহার মন্দ কার্য সংশোধন করিয়া দেওয়া; (৬) প্রহার করতঃ আহত করার ধমকি প্রদান; (৭) প্রহার করা এবং (৮) সর্বশেষে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দলে-বলে পাপীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

প্রথম স্তর ঃ সর্বপ্রথম পাপীর পাপ কর্মের অবস্থা নিঃসন্দেহরূপে অবগত হওয়া পাপ প্রতিরোধকারীর কর্তব্য। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিয়া, দরজার নিকট কিংবা ছাদের উপর লুকাইয়া শুনিবার এবং প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার চেষ্টা করিবে না। বস্ত্রাঞ্চলে কেহ কোন মন্দ বস্তু লুকাইয়া রাখিলে তাহা টিপিয়া বা হাতড়াইয়া দেখিবে না। কিন্তু অনুসন্ধান ব্যতীত বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শোনা গেলে কিংবা মদের গন্ধ পাওয়া গেলে প্রতিরোধ করা দুরস্ত আছে। এতদ্ব্যতীত দুইজন

ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী সংবাদ দিলে তাহা বিশ্বাস করিবে। দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য পাওয়া গেলে, যে গৃহে অপকর্ম চলিতেছে, গৃহস্বামীর বিনানুমতিতে তথায় প্রবেশ করত ঃ পাপ দমন করা দুরস্ত আছে। কিন্তু একজন সাক্ষীর কথা শ্রবণ করিয়া কাহারও গৃহে প্রবেশ না করাই উত্তম। কারণ, প্রত্যেকেরই স্বীয় গৃহে ইচ্ছানুযায়ী সুবিধা ভোগ করিবার অধিকার আছে এবং একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা সঙ্গত নহে। কথিত আছে যে, লুকমান হাকীমের আংটিতে খোদিত ছিলঃ অনুমানের উপর নির্ভর করতঃ কাহাকেও লাঞ্চিত করা অপেক্ষা প্রকাশ্যে পাপ গোপন করা উত্তম।

দ্বিতীয় স্তর ঃ পাপাচারীকে উহার অপকারিতা বুঝাইয়া দিবে। কারণ সে হয়ত এমন কোন কার্য করে যাহার অপকারিতা সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। যেমন, কোন মুর্খ ব্যক্তি মসজিদে নামায পড়িতেছে এবং রুকূ, সিজদা পুরাপুরি আদায় করিতেছে না অথবা তাহার পরিহিত বস্ত্রে নাপাকিসহ নামায পড়িতেছে। অবহিত থাকিলে সে এইরূপভাবে নামায পড়িত না। সুতরাং তাহাকে অবহিত করা ও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এমন নম্রতার সহিত সহজভাবে শিক্ষা প্রদান করিবে যাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া না উঠে। কোন মুসলামানকে বিনা কারণে ক্রুদ্ধ করিয়া তোলা উচিত নহে। কারণ, তুমি যখন কাহাকেও কোন বিষয় শিক্ষা দিতে যাইবে প্রকৃতপক্ষে তুমি তখন তাহাকে অজ্ঞ সাজাইবে এবং তাহার ত্রুটি বর্ণনা করিবে। মলম ব্যতীত এই আঘাত কেহই সহ্য করিতে পারে না। মলম এই যে, তুমি তাহাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতঃ বলিবে ঃ মাতৃগর্ভ হইতে কেহই শিক্ষা করিয়া আসে না এবং যাহারা জানে না তাহাদের মাতাপিতা ও উস্তাদ এইজন্য দায়ী। সম্ভবত আপনাকে শিক্ষা দেওয়ার মত কোন আলিম আপনার আশেপাশে নাই।

মোটকথা এইরূপ কথা দ্বারা পাপাচারীর মন সন্তুষ্ট করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ করে না অথবা (পাপীকে দেখিয়া) বিরক্ত হয়, সে এমন ব্যক্তি সদৃশ যে, রক্তমাখা কাপড় প্রস্রাব দ্বারা ধৌত করিতেছে; একটি পুণ্যের কাজ করিতে গিয়া অপর একটি পাপ করিয়া বসে।

তৃতীয় স্তর ঃ নম্রতার সহিত উপদেশ প্রদান করিবে। কটু কথা বলিবে না। কারণ, পাপী স্বয়ং যে স্থলে পাপকর্মকে হারাম বলিয়া জ্ঞাত আছে, সেখানে উহার দোষ বর্ণনাতে কোন ফল হইবে না। এমন স্থলে সংক্ষেপে বর্ণনা করাই বাঞ্ছনীয়। উহাতে নম্রতা এই যে, মনে কর এক ব্যক্তি অগোচরে পরনিন্দা করিতেছে। তাহাকে বলিবে-দেখ, আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি একেবারে নির্দোষ? সুতরাং পরের দোষ না

গাহিয়া নিজের দোষের দিকে লক্ষ্য করা উচিত। অথবা পরনিন্দার শাস্তি পাঠ করিয়া তাহাকে শুনাইবে। এ স্থলে উপদেশদাতার পক্ষে এমন এক গুরুতর আপদ রহিয়াছে যাহা হইতে আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কেহই রক্ষা পাইতে পারে না। কারণ, উপদেশ প্রদানকালে উপদেষ্টার প্রবৃত্তি দুইটি শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে। প্রথমতঃ নিজের জ্ঞান ও পরহিযগারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে এবং দ্বিতীয়; নিজের প্রভুত্ব ও প্রাধান্যজনিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে। মানবদেহের এই দুইটি পীড়া মান-সম্ভ্রম ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা হইতে উৎপত্তি হইয়া থাকে। মানব প্রকৃতিই এইরূপ যে, অধিকাংশ সময় সে মনে করেঃ আমি ওয়ায-নসীহত করিয়া বেড়াই এবং আমি শরীয়ত অনুসরণ করিয়া চলিতেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন উপদেষ্টা মান-সম্ভ্রম ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার দাস হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার এই পাপ অপরের সেই পাপ হইতে জঘণ্য যাহা দূরীকরণার্থে সে ওয়ায-নসীহত করিয়া বেড়াইতেছে। এমতাবস্থায় গভীর মনোনিবেশ সহকারে এই উপদেষ্টার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত-যাহাকে তিনি উপদেশ প্রদান করিতে যাইতেছেন, যদি সেই ব্যক্তি নিজে নিজে অথবা অন্য কোন উপদেষ্টার উপদেশে পাপ পরিত্যাগ করে, তবে উহা তাঁহার উপদেশে পরিত্যক্ত হওয়া অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় বলিয়া তাঁহার নিকট মনে হয় কিনা এবং এইরূপ স্থলে তিনি নিজে তাহাকে উপদেশ প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হন কিনা। যদি তাহাই হয় তবে এইরূপ উপদেষ্টারই ওয়ায-নসীহত করা শোভা পায়। কিন্তু তিনি যদি পছন্দ করেন যে, সে তাঁহার উপদেশেই পাপ বর্জন করুক, তবে এমন উপদেষ্টার আল্লাহ্‌কে ভয় করা আবশ্যক। কারণ, তাহার এরূপ ওয়ায-নসীহত তাহাকে আত্মশ্লাঘা ও আত্ম-তৃপ্তির দিকে আহ্বান করে, আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত করে না।

হযরত দাউদ তায়ী (র)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিলঃ যে ব্যক্তি বাদশাহের দরবারে যাইয়া তাঁহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে, তাঁহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তিনি বলিলেনঃ আমার এই আশংকা হয় যে, বাদশাহ তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিবেন। লোকে বলিল ঃ তিনি তো বেত্রাঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা রাখেন। তিনি বলেন ঃ আমার এই আশংকা হয় যে, বাদশাহ্ তাঁহাকে হত্যা করিবেন। লোকে বলিল ঃ তিনি জীবন দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি বলিলেন ঃ আমি তাঁহার জন্য এমন এক আপদের আশংকা করি যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক গুপ্ত। ইহা হইল 'আমি শ্রেষ্ঠ', এই মনোভাব।

হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন ঃ অমুক খলীফাকে পাপ কার্য হইতে নিবৃত্ত করার আমার ইচ্ছা হইল এবং আমি ভাবিলাম যে, তিনি আমাকে হত্যা করিয়া

ফেলিলেন। ইহাতে আমি ভীত হইলাম না। কিন্তু তাঁহার দরবারে বহু লোক উপস্থিত ছিল। তাই আমার আশংকা হইল যে, তাহারা দেখিবে আমি ঈমানদারীতে অকপট এবং শরীয়তের বিধান লঙ্ঘনকারীদের প্রতি অতীব কঠোরঃ আর ইহা আমার মনে ভাল লাগিবে। ফলে আমি এমন অবস্থায় মরিব যাহাতে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকিবে না।

চতুর্থ স্তর ঃ কর্কশ কথা বলা। ইহার দুইটি নিয়ম আছে। প্রথমতঃ যে পর্যন্ত নম্র ও সদয় উপদেশ ফলদায়ক হয়, সে পর্যন্ত কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিবে না। দ্বিতীয়তঃ উপদেশ প্রদানে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিবে না এবং যাহা বলিবে সত্য বলিবে। যেমন, পাপাচারীকে জালিম, ফাসিক, জাহিল, আহমক বলিবে; ইহার অতিরিক্ত বলিবে না। কারণ, যে ব্যক্তি পাপ করে সে নির্বোধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ "যে ব্যক্তি নিজের হিসাব-নিকাশ করে এবং মৃত্যুকে দেখিতে থাকে, সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং গর্বিত থাকে ও মনে করে, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করিবেন, সে নির্বোধ।" ফলপ্রদ হইবে, এইরূপ আশা থাকিলেই উপদেশ প্রদানকালে কর্কশ বাক্য প্রয়োগ সঙ্গত। আর যখন বুঝিবে যে, ফলপ্রদ হইবে না, তখন কর্কশ মেজাজে ঘৃণার চোখে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে এবং তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে।

পঞ্চম স্তর ঃ হস্ত দ্বারা মন্দ কার্য সংশোধন করিয়া দেওয়া। ইহারও দুইটি নিয়ম আছে। প্রথমত ঃ পাপাচারীকে সংশোধিত হওয়ার জন্য যথাসাধ্য বলিবে। যেমন, রেশমী বস্ত্র পরিধানকারীকে বলিবে, রেশমী বস্ত্র পরিত্যাগ কর। জোরপূর্বক অপরের জমি দখলকারীকে বলিবে অপরের জমি হইতে বাহির হইয়া যাও। মদ্যপায়ীকে বলিবে, মদ ফেলিয়া দাও। নাপাকি অবস্থায় মসজিদে প্রবেশকারীকে বলিবে, মসজিদ হইতে বাহির হও। দ্বিতীয়তঃ মুখের কথা কার্যকরী না হইলে বল প্রয়োগে তাহাকে তথা বাহির করিয়া দিবে। ইহারও একটি নিয়ম আছে। সামান্য বল প্রয়োগ কার্য সিদ্ধ হইলে বাড়াবাড়ি করিবে না। যেমন হাতে ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে পারিলে তাহার ঘাড়ে ধরিবে না এবং পা ধরিয়া হেঁচড়াইবে না। বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিতে হইলে ইহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবে না। রেশমী বস্ত্র আস্তে আস্তে খুলিবে যেন ছিঁড়িয়া না যায়। মদ ফেলিতে পারিলে ইহার পাত্র ভাঙ্গিবে না। কিন্তু পাত্রটি হাতে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া ঢালিয়া ফেলিবার উপায় না থাকিলে প্রস্তর নিক্ষেপে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইতে পারে। ইহাতে ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে না। আর মদের পাত্রটির মুখ যদি সংকীর্ণ হয় এবং উহা হইতে মদ ঢালিয়া ফেলিতে ফেলিতে মদ্যপায়ীরা আসিয়া মারধর করিবার আশংকা থাকে তবে পাত্রটি ভাঙ্গিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবে।

মদ প্রথম হারাম হওয়ার সময় যে পাত্রে মদ রাখা হইত, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলার আদেশ ছিল। তৎপর এই আদেশ রহিত হইয়াছে। কোন কোন আলিম বলেন, সেকালে মদের যে পাত্র ভাঙ্গিয়া দেওয়ার নির্দেশ ছিল তাহা মদের জন্য নির্দিষ্ট পাত্র ছিল। আজকাল যেহেতু ইহার জন্য কোন নির্দিষ্ট পাত্র নাই, কাজেই বিনা কারণে মদের পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলা সঙ্গত নহে। বিনা কারণে ভাঙ্গিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

ষষ্ঠ স্তর ঃ ধমকি দেওয়া ও ভয় প্রদর্শন করা। যেমন, মদখোরকে বলিবে, মদ ফেলিয়া দে, অন্যথায় তোর মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিব বা তোকে খুব অপমানিত করিব। সহজে কাজ না হইলে এইরূপ ধমক দেওয়া দুরস্ত আছে। কিন্তু ইহারও দুইটি নিয়ম আছে। প্রথমত, শরীয়ত অনুযায়ী না-দুরস্ত কার্যের ভয় দেখাইবে না। যেমন, এইরূপ উক্তি করিবে না যে, তোমার বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিব, তোমার বাড়িঘর ভাঙ্গিয়া দিব এবং তোমার স্ত্রী ও সান্তান-সন্তুতির প্রতি অত্যাচার করিব। দ্বিতীয়ত ঃ ধমকিতে এমন উক্তি করিবে যাহা করিবার ক্ষমতা তোমার আছে যেন উহা মিথা না হইয়া পড়ে। 'তোমার শিরশ্ছেদ করিব, 'তোমাকে শূলে দিব' এইরূপ কথা বলিবে না। কিন্তু যে পরিমাণ শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা আছে, যদি মনে হয় যে, তদতিরিক্ত ভয় দেখাইলে পাপাচারী ভীত হইয়া পাপ বর্জন করিবে, তবে অতিরিক্ত ভয় প্রদর্শন করাও জায়েয আছে। যেমন, বিবদমান দুই ব্যক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে অপরের অনিষ্ট না হয় এমন অসত্যের আশ্রয় লওয়াও জায়েয আছে।

সপ্তম স্তর ঃ হস্ত-পদ ও লাঠি দ্বারা আঘাত করা। প্রয়োজনের সময় আবশ্যক পরিমাণ ইহা জায়েয আছে। পাপাচারী যখন প্রহার ব্যতীত পাপ বর্জন করে না, তখনই ইহার প্রয়োজন হয়। কিন্তু পাপ ছাড়িয়া দিলে প্রহার করিবে না। পাপ করার পর ইহার জন্য শরীয়ত অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করাকে অবস্থাবিশেষে 'তাযীর' ও 'হদ' বলে। এই দুই প্রকার শাস্তি প্রদানের অধিকার কেবল বাদশাহের আছে। প্রহার দ্বারা পাপ প্রতিরোধের নিয়ম এই যে, হস্ত দ্বারা প্রহার করতঃ কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকা পর্যন্ত লাঠি দ্বারা প্রহার করিবে না এবং মুখমণ্ডলে আঘাত করিবে না। ইহাতে ফল না হইলে তলোয়ার বাহির করিয়া ভয় প্রদর্শন করিবে। কোন পুরুষ কোন বেগানা স্ত্রীলোকের গলা জড়াইয়া ধরিলে যদি মনে কর যে, তলোয়ার বাহির করিয়া ভয় প্রদর্শন না করিলে সে তাহাকে ছাড়িবে না, তবে তলোয়ার বাহির করিয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করা সঙ্গত। কিন্তু প্রতিরোধকারী ও সেই ব্যক্তির মধ্যস্থলে কোন নদী ব্যবধান থাকিতে ধনুকে তীর সংযোগ করতঃ তাহাকে ধমকাইয়া বলিবে ঃ স্ত্রীলোকটিকে না ছাড়িলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করা দুরস্ত আছে। কিন্তু উরু কিংবা পায়ের

গোছায় তীর নিক্ষেপ করিবে, সঙ্গিন স্থানে নিক্ষেপ করিবে না।

অষ্টম স্তর ঃ পাপ প্রতিরোধকারী একাকী না পারিলে স্বপক্ষের লোকদিগকে দলবদ্ধ করিয়া পাপীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। এমতাবস্থায় পাপীরাও হয়ত সদলবলে তাহাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবে। এইজন্যই কতিপয় আলিম বলেনঃ এইরূপ সম্ভাবনা থাকিলে বাদশাহের অনুমতি ব্যতীত পাপীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত নহে। কারণ, ইহাতে অশান্তি ও বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি হইবে। আবার কতিপয় আলিম বলেন ঃ বাদশাহের অনুমতি ব্যতীত যেমন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা দুরস্ত আছে, তদ্রূপ ফাসিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও দুরস্ত আছে। কেননা, পাপ প্রতিরোধকারী ইহাতে মারা গেলে শহীদ হইবে।

পাপ প্রতিরোধকারীর গুণাবলী ঃ পাপ প্রতিরোধকারীর তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। (১) ইল্‌ম, (২) পরহিযগারী ও (৩) সৎস্বভাব। কারণ, ইল্‌ম না থাকিলে তিনি ভাল-মন্দ কার্যে পার্থক্য করিতে পারিবেন না; পরহিযগারী না থাকিলে ভাল-মন্দ কার্যে পার্থক্য করিতে পারিলেও তাহার কার্যে স্বীয় হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে বিমুক্ত হইবে না এবং সৎস্বভাবী না হইলে লোকে দুঃখ-কষ্ট প্রদান করিলে ক্রোধের বশীভূত হইয়া তিনি আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া যাইবেন ও সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলিবেন। এমতাবস্থায় তিনি প্রত্যেকটি কার্য প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া করিবেন, ধর্মের খাতিরে নহে এবং তখন তাঁহার পাপ প্রতিরোধ কার্য পাপের কারণ হইয়া উঠিবে। এইজন্যই একবার হযরত আলী (রা) যখন এক কাফিরকে পরাজিত করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার নিমিত্তে তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন এবং সে তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডলে থু-থু নিক্ষেপ করিল তখন তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন ঃ যখন আমার হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে তখন আশংকা হইল যে, এখন এই হত্যা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হইবে না। আর হযরত উমর (রা) একদা এক পাপীকে দুর্রা মারিতেছিলেন এমন সময় সে হতভাগা তাহাকে গালি দিল। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাকে প্রহার করা বন্ধ করিয়া দিলেন। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ এতক্ষণ আমি তাহাকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রহার করিতেছিলাম। এখন সে আমাকে গালি দিল। সুতরাং এখন তাহাকে প্রহার করিলে ইহা ক্রোধের কারণে হইবে।

হাদীস শরীফ হইতে বুঝা যায় যে, পাপ-প্রতিরোধকারীর মধ্যে উপরিউক্ত তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কেবল এমন ব্যক্তিই মন্দ কার্যে প্রতিরোধ করিবে যে ব্যক্তি যে কাজে আদেশ বা প্রতিরোধ করা হইবে, তৎসম্বন্ধে

আলিম এবং সে কার্যে ধৈর্যশীল ও নম্র। হযরত হাসান বস্‌রী (র) বলেন ঃ তুমি অপরকে যে কাজের আদেশ করিতে ইচ্ছা কর, প্রথমে তদনুযায়ী স্বয়ং তোমার কার্য করা উচিত। সৎকার্যে আদেশ-প্রদানকারীর জন্য ইহা একটি নিয়মমাত্র, শর্ত নহে। কারণ, লোকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমরা স্বয়ং আমল না করা পর্যন্ত কি সৎকার্যে আদেশ ও মন্দকার্যে প্রতিরোধে বিরত থাকিব? হুযূর (সা) বলিলেনঃ না, তাহা নহে। যদিও তোমরা সেই কার্য করিতে না পার তথাপি সৎকাজে আদেশ ও মন্দকার্যে প্রতিরোধ করা বর্জন করিও না।

ধৈর্যশীলতা ঃ ধৈর্যশীল হওয়া এবং নিজের উপর যত দুঃখ-কষ্টই আসুক না কেন, উহা অকাতরে সহ্য করা সৎকার্যে আদেশ ও মন্দকার্যে প্রতিরোধের অপর একটি নিয়ম। কারণ, আল্লাহ্ বলেন ঃ

সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ।

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ–

আর নেক কাজে আদেশ ও মন্দ কার্যে প্রতিরোধ করিতে থাক এবং তোমার উপর যে বিপদাপদ আসে উহাতে ধৈর্য ধারণ কর।

সুতরাং যে ব্যক্তি দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে না পারে তাহার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না।

লোভ শূণ্যতা ঃ অপর একটি অত্যাবশ্যক নিয়ম এই যে, সংসারের সহিত সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধকারীর সংশ্রব কম থাকিবে এবং তাঁহার লোভও খুব অল্প হইবে। কারণ যে স্থলে প্রতিরোধকারী লোভী ও প্রত্যাশী হইবেন, সেখানেই তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। পূর্বকালীন কোন এক বুযর্গ এক কসাই-এর দোকান হইতে বিড়ালের জন্য গোশতের পর্দা কুড়াইয়া আনিতেন। একদা উক্ত কসাই কর্তৃক কোন মন্দকার্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া তিনি প্রথমে স্বীয় গৃহে গমনপূর্বক বিড়ালটিকে ত্যাগ করিলেন এবং তৎপর কসাই-এর দোকানে যাইয়া তাহাকে পাপকার্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন। কসাই তাঁহাকে বলিলঃ আচ্ছা, আপনি কি আর গোশতের পর্দা পাইতে আশা করেন না? তিনি বলিলেনঃ আমি প্রথমেই বিড়ালটি ত্যাগ করিয়া তৎপর তোমাকে উপদেশ দিতে আসিয়াছি। লোকের ভালবাসা, প্রশংসা ও সন্তুষ্টি যে লাভ করিতে চায়, সে পাপ নিবারণে সমর্থ হইবে না।

নম্রতা ও শিষ্টাচার ঃ পাপ প্রতিরোধের আসল নিয়ম এই যে, পাপ করে বলিয়া পাপাচারীর জন্য পাপ প্রতিরোধকারী অন্তর্দাহ ভোগ করিবে, তাহার প্রতি সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিবে এবং তাহাকে পাপ বর্জনের জন্য এইরূপ স্নেহ ভাষণে উপদেশ প্রদান

করিবে যেমন পিতা স্বীয় সন্তানকে বারণ করিয়া থাকে ও তাহার সহিত নম্র ব্যবহার করিবে। এক ব্যক্তি খলীফা মামুনকে উপদেশ প্রদান করিতে যাইয়া কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিল। খলীফা বলিলেন ঃ হে যুবক! আল্লাহ্ তোমা অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট মহাপুরুষকে আমা অপেক্ষা বহুগুণে নিকৃষ্ট ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়া তাহার সহিত নম্র ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছিলেন। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারুন (আ)-কে ফিরাউনের নিকট পাঠাইয়া নির্দেশ দিলেন ঃ

তোমরা উভয়ে তাহার সহিত নম্রভাবে কথা বলিও।"

বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ করাই প্রত্যেকের কর্তব্য।

এক যুবক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমাকে যিনা (ব্যাভিচার) করিবার অনুমতি প্রদান করুন। সাহাবা (রা) চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে প্রহার করিতে চাহিলেন। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তাহাকে মারিও না। তৎপর তিনি তাহাকে নিজের নিকট ডাকিয়া আনিয়া জানুর সহিত জানু মিশাইয়া উপবেশন করাইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে যুবক! কেহ তোমার মাতার সহিত এ কাজ করুক, তাহা তুমি পছন্দ কর কি? যুবক বলিল, না। হুযূর (সা) বলিলেনঃ অপর লোকেও ইহা পছন্দ করে না। তৎপর হুযূর (সা) বলিলেনঃ আচ্ছা, তোমার কন্যার সহিত কেহ এইরূপ কুকর্ম করুক, ইহা তুমি পছন্দ কর কি? এইরূপে তাহার বোন, ফুফু ও খালা সম্বন্ধে সে এইরূপ কুকর্ম পছন্দ করে কি না, তিনি তাহাকে একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যুবকও প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই 'না' বলিতে লাগিল। হুযুর (সা)-ও বলিতেছিলেন যে, তদ্রূপ অপর লোকেও ইহা পছন্দ করে না। অতঃপর হুযূর (সা) যুবকটির বক্ষস্থলে স্বীয় পবিত্র হস্ত বুলাইয়া প্রার্থনা করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! তাহার মনকে পবিত্র কর, তাহার গুপ্ত অঙ্গকে পাপ হইতে রক্ষা কর এবং তাহার পাপ ক্ষমা কর। তৎপর যুবক হুযূর (সা)-এর পবিত্র দরবার শরীফ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং চিরজীবন যিনাকে সর্বাপেক্ষা অধিক শত্রু বলিয়া মনে করিতেন।

হযরত সুফিয়ান উয়াইনাহ্ (র) বাদশাহের উপঢৌকন গ্রহণ করেন বলিয়া লোকে হযরত ফুযায়ল আয়ায (র)-এর নিকট অভিযোগ করিল। তিনি বলিলেন ঃ রাজকোষে তাঁহার প্রাপ্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি। তৎপর হযরত ফুযায়ল (র) হযরত সুফিয়ান (র)-কে নির্জনে দেখিতে পাইয়া বাদশাহের উপঢৌকন গ্রহণের জন্য তাঁহার প্রতিক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। হযরত সুফিয়ান (র) বলিলেন ঃ হে আবূ আলী! যদিও আমি নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত নহি, তথাপি আমি নেককারগণকে

ভালবাসি। হযরত সলত ইব্নে আসীম (র) স্বীয় শাগরেদগণের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় সেই স্থান দিয়া একজন লোক অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। অহংকারী আরববাসীদের অভ্যাস অনুযায়ী তাহার পরিহিত তহবন্দ মাটি ঘেঁসিয়া যাইতেছিল। ইহা শরীয়তে নিষিদ্ধ। সুতরাং শাগরেদগণ তাহার সহিত কঠোর ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু তিনি স্বীয় শাগরেদগণকে বলিলেন ঃ তোমরা চুপ থাক। আমি ইহার প্রতিবিধান করিব। তৎপর তিনি লোকটিকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন ঃ ভ্রাতঃ, আপনার সহিত আমার প্রয়োজন আছে। লোকটি কি প্রয়োজন, জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন ঃ আপনার তহবন্দ একটু উপরে উঠাইয়া পরিধান করুন। লোকটি বলিল ঃ বহুত আচ্ছা। তৎপর তিনি শাগরেদগণকে বলিলেন ঃ কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিলে লোকটি আমার কথা মানিত না এবং সে গালি দিয়া বসিত।

এক ব্যক্তি এক মহিলাকে ধরিয়া ছুরি বাহির করিল। কেহই তাহার সম্মুখে যাইতে সাহস পাইতেছিল না এবং মহিলটি চীৎকার করিতেছিল। হযরত বিশরে হাফী (র) লোকটির নিকটবর্তী হইয়া স্বীয় স্কন্ধ তাহার স্কন্ধের সহিত ঠেকাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ লোকটি বেহুঁশ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং তাহার দেহ হইতে ঘর্ম নির্গত হইতে লাগিল। মহিলাটি তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া চলিয়া গেল। লোকটি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ তোমার কি হইয়াছিল? সে বলিল ঃ এতটুকু জানি যে, এক ব্যক্তি আমার নিকটে আসিয়া তাহার দেহ আমার দেহের সহিত মিলাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন ঃ আল্লাহ দেখিতেছেন, তুমি কোথায় এবং কি করিতেছ। তাঁহার এতটুকু কথা শুনিয়া আমার মনে এমন ভীতির সঞ্চার হইল যে, আমি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলাম। লোকে তাহাকে জানাইল ঃ তিনি হযরত বিশরে হাফী (র) ছিলেন। লোকটি লজ্জিত হইয়া বলিল ঃ হায়! এই অনুতাপ লইয়া কিরূপে আমি তাঁহার দর্শনলাভ করিব? সেই সময়ই সে ব্যক্তি জ্বরাক্রান্ত হয় এবং সপ্তাহকাল মধ্যে সে প্রাণত্যাগ করে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত মন্দকার্য ঃ বর্তমানে সমস্ত জগত অপকর্মে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং উহা সংশোধন করা দুষ্কর ভাবিয়া লোকে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, মানুষ সকল কাজের ক্ষমতা সমানভাবে রাখে না বলিয়া যে সমস্ত কাজ করিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে, উহা হইতেও তাহারা নিজেদের হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া

রাখিয়াছে। ধর্মপরায়ণ লোকদের অবস্থা এইরূপ, অপর পক্ষে ধর্ম-কর্মে উদাসীন লোকেরা স্বয়ং এই সকল অপকর্ম প্রচলনে সন্তুষ্ট রহিয়াছে।

তুমি যাহা করিতে সমর্থ তাহাতে নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকা তোমার জন্য দুরস্ত নহে। আজকাল যে সকল মন্দ কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে উহাদের প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নহে। সুতরাং সেই সমস্ত মন্দ কার্যকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব মাত্র। এই মন্দ কার্যগুলির কতক মসজিদে, কতক বাজারে ও পথেঘাটে, কতক গোসলখানায় এবং কতক গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মসজিদে অনুষ্ঠিত মন্দ কার্য ঃ মসজিদে অনুষ্ঠিত মন্দ কার্যগুলি এইরূপ ঃ নামায পড়িবার সময় যথারীতি সুন্দরভাবে তা আদায় না করা; গানের সুরে কুরআন শরীফ পাঠ করাঃ একাধিক মুয়াযযিন একযোগে আযান দেওয়া এবং সমস্বরে আযানের আওয়ায খুব চড়াইয়া দেওয়া। এইরূপে আযান দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্ ও হায়্যা আলাল ফালাহ্' বলিবার সময় সমস্ত শরীর কিবলার দিক হইতে ফিরাইয়া লওয়া। রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া ও স্বর্ণখচিত তরবারি কোমরে ঝুলাইয়া খুতবা পাঠ করা, এইরূপ কার্য হারাম। মসজিদে সমবেত হইয়া হাঙ্গামা করা, বাজে গল্প করা, কবিতা পাঠ করা, তাবীয বা অন্য কোন বস্তু বিক্রয় করা। শিশু, মাতাল ও উম্মাদকে মসজিদে প্রবেশ করতঃ হট্টগোল করিতে দেওয়া এবং এইরূপে নামাযিগণকে কষ্ট দেওয়া। কিন্তু শিশু চুপ থাকিলে ও মাতাল কাহাকেও কষ্ট না দিলে এবং মসজিদ অপবিত্র না করিলে তাহাদের মসজিদে আগমণ দুরস্ত আছে। কিন্তু কোন শিশু মসজিদে কোন কোন সময় শিশুসুলভ খেলাধূলা করিলে তাহাকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া ওয়াজিব নহে। কারণ, মদীনা শরীফের মসজিদে হাবশী বালকগণ কুচকাওয়াজ করিয়াছিল। হযরত আয়েশা (রা) ইয়া দর্শন করিয়াছিলেন কিন্তু মসজিদকে ক্রীড়া-কৌতুকের স্থান বানাইয়া লইলে তাহাদিগকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্যক। মসজিদে বসিয়া বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে কাপড় সেলাই করিলে কিংবা কোন কিছু লিখিলে, যদি ইহাতে অপর লোকের কষ্ট না হয় তবে দুরস্ত আছে। কিন্তু সর্বদা মসজিদে বসিয়া এ সমস্ত কার্যের ব্যবসায় করা মাকরূহ।

শাসন কার্য পরিচালনা করা, কবালা লিখন ইত্যাদি যে সকল কার্যে প্রভুত্ব প্রকাশ পায়, এমন কার্য সর্বদা মসজিদে করা সঙ্গত নহে। তবে কখন কখন করা যাইতে পারে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখন কখন মসজিদে বসিয়া শাসন কার্য পরিচালনা

করিতেন। কিন্তু এই কার্যের জন্য তিনি কখনও মসজিদকে এজলাস বানাইয়া লাইতেন না। ধোপা মসজিদে কাপড় শুকাইলে এবং রং রজক মসজিদে কাপড় রাঙাইলে বা শুকাইলে তাহাদিগকে নিষেধ করিতে হইবে। কেননা, মসজিদে এ সমস্ত করা অন্যায়। যাহারা বাড়াইয়া-কমাইয়া এমন কাহিনীসমূহ মসজিদে বর্ণনা করে যাহা হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবে উল্লেখ নাই, তাহাদিগকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। পূর্বকালীন বুযর্গগণ এইরূপই করিতেন।

যাহারা সর্বদা সাজসজ্জা করিয়া সুন্দর ও পরিপাটি হইয়া থাকে, কামভাব যাহাদের প্রবল, ছন্দময় বুলি আওড়াইয়া কিংবা গান সংযোগে বৃক্তা করে এবং যুবতী মহিলাগণ মসজিদে বিদ্যমান থাকে, এমন ব্যক্তিকে মসজিদে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হারাম। বরং মসজিদের বাহিরেও এমন ব্যক্তিকে বক্তৃতা করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। বক্তা এইরূপ হওয়া উচিত যাহার বাহ্য আকৃতি দরবেশজনোচিত বেশভূষায় সজ্জিত এবং যিনি ধার্মিক লোকের ন্যায় পোশাক পরিহিত। কোন অবস্থাতেই যুবতী মহিলাদিগকে পুরুষের সভায়, মধ্যস্থলে পর্দা ব্যতীত এক বৈঠকে মিলিতভাবে বসিতে দেওয়া দুরস্ত নহে। হযরত আয়েশা (রা) তাঁহার যমানায় স্ত্রীলোকদিগকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিতেন যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় স্ত্রীলোকগণ মসজিদে যাইত। হযরত আয়েশা (রা) আরও বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ কালের অবস্থা দর্শন করিলে অবশ্যই তিনি স্ত্রীলোকদিগকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিতেন।

মোটকথা, মসজিদে কাচারী মিলাইয়া বসা, কোন বস্তু ভাগ-বন্টন করিয়া লওয়া, কারবার করা, দেনা-পাওনা ও হিসাব-নিকাশ চুকান অথবা মসজিদে বসিয়া ইহাকে তামাশার স্থানে পরিণত করা, গীবত করা, বাজে বকবক করা ইত্যাদি কার্য করা অসঙ্গত। এই সমস্ত কার্য মসজিদের মর্যাদা ও পবিত্রতার পরিপন্থী।

হাটে-বাজারে অনুষ্ঠিত মন্দ কার্য ঃ ক্রেতার সহিত মিত্যা বলা ও পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা, পাল্লা-বাটখারা, গজ ঠিকমত না রাখা, পণ্যদ্রব্যে লোকদের সহিত প্রতারণা করা, ঈদের মধ্যে শিশুদের জন্য বাদ্যযন্ত্র, প্রাণীর ছবি ও পুতুলাদি বিক্রয় করা, নববর্ষ দিবসে কাষ্ঠ নির্মিত ঢাল-তলোয়ার বিক্রয় করা, 'সদহ' উৎসবের দিন মাটির চুঙ্গা ও পাপিয়া পাখি বিক্রয় করা (পারসিক বৎসরের একাদশ মাস 'বাহমন'-এর দশম তারিখে যে উৎসব করা হয় তাহাকে 'সদহ' বলে)। রিফু করা ও ধোলাই করা পুরাতন বস্তু নুতন বলিয়া বিক্রয় করা। যে সমস্ত ব্যাপারে লোকদিগকে প্রতারিত করা হয়, তৎসমূদয়ের প্রত্যেকটির অবস্থাই একরূপ। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত ধূপদান, পানিপাত্র, দোয়াত, বাসন ইত্যাদি বিক্রয় করা। ইহাদের কতক হারাম,

কতক মাকরূহ্। প্রাণীর ছবি ও মূর্তি নির্মাণ এবং ক্রয়-বিক্রয় হারাম আর কাষ্ঠনির্মিত ঢাল-তলোয়ার, মৃত্তিকা নির্মিত চুঙ্গা প্রভৃতি যাহা কিছু জাতীয় উৎসব ও নববর্ষ দিবস্ উপলক্ষে বিক্রয় করা হয়, সেই সমস্ত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় মূলত ঃ হারাম নহেঃ কিন্তু অগ্নিপূজক সম্প্রদায়ের রীতিনীতি প্রকাশক বলিয়া হারাম। কারণ, যে সমস্ত কার্য কাফির-অগ্নিপূজক-পৌত্তলিকদের রীতিনীতি ও চালচলন প্রকাশক, তৎপরসমূদয়ই শরীয়ত বিরুদ্ধ এবং নাজায়েয। এ সমস্ত দিবসের জন্য যাহাকিছু প্রস্তুত করা হয়, সবই নাজায়েয। বরং নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে হাট-বাজার সজ্জিত করা, মণ্ডা-মিঠাই প্রস্তুত করা এবং জাঁকজমকপূর্ণ বেশভূষা ধারণ করা শরীয়ত বিরোধী কার্য। কারণ, নববর্ষ, 'সদহ' প্রভৃতি যে সকল উৎসব অমুসলমান কাফিরগণ করিয়া থাকে, সেই সকলের মূলোৎপাটন করিয়া ফেলাই আবশ্যক; যেন মানুষ উহার নাম পর্যন্ত ভুলিয়া যায়।

প্রাচীনকালের কতিপয় আলিম বলেন ঃ বিজাতীয় ও বিধর্মীদের উৎসব দিবসে মুসলমানগণের বোজা উচিত যাহাতে উক্ত দিবস উপলক্ষে প্রস্তুত মণ্ড-মিঠাই প্রভৃতি মুসলমানের ভক্ষণে অসিয়া না পড়ে এবং সেই সকল উৎসবের রাত্রে মুসলমানদের গৃহে প্রদীপ জ্বালা রাখা উচিত নহে যেন সেই রাতে অগ্নি তাহাদের দৃষ্টিপথেই আসিতে না পারে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন ঃ উক্ত উৎসব-দিবসে রোযা রাখাও উহা স্মরণ করাইয়া দেয়; অথচ কোনরূপই উক্ত দিবসকে স্মরণ পথে আসিতে দেওয়া উচিত নহে; বরং অন্যান্য দিনের মতই উহাকে অতিবাহিত হইতে দেওয়া উচিত তাহা হইলে ইহাদের নাম এবং চিহ্নও আর অবশিষ্ট থাকিবে না।

পথে-ঘাটে অনুষ্ঠিত মন্দ কার্য ঃ রাস্তায় খুঁটি গাড়িয়া দোকান ঘর নির্মাণ করত ঃ চলাচলের পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলা, রাস্তার ধারে বৃক্ষ রোপন করা, মূল দালান হইতে বারান্দা গাঁথিয়া রাস্তার দিকে বাহির করিয়া দেওয়া, পানি নিকাশের জন্য দালানের ছাদ হইতে পাইপ স্থাপনপূর্বক রাস্তার উপর ঝুলাইয়া দেওয়া ইত্যাদি। কারণ, যানবাহনে আরোহী যাত্রী এই সকলে ধাক্কা লাগিতে পারে। রাস্তার উপর দ্রব্যসম্ভারের স্তূপ লাগইয়া রাখা বা কোন জন্তু বাঁধিয়া রাখিয়া চলাচলের পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলা ইত্যাদি কার্য দুরস্ত নহে। কিন্তু অত্যাবশ্যক হইলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ করা যাইতে পারে। যেমন পমু বা গাড়ি হইতে মালের বোঝা রাস্তার উপর নামাইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে লইয়া যাওয়া। গাধার পিঠে কাঁটার বোঝা চাপাইয়া সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া চালাইয়া নেওয়া উচিত নহে। কারণ, পথিকের পরিহিত বস্ত্র কাঁটায় লাগিয়া ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই পথ ব্যতীত গাধা চালাইয়া নেওয়ার অন্য কোন পথ না থাকিলে

চালাইয়া নেওয়া যাইতে পারে। পশুর উপর ইহার সাধ্যাতীত ভারবিশিষ্ট বোঝা চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। রাস্তার উপর গরু-ছাগলাদি যবেহ্ করা ও গোশত তৈয়ার করা অসঙ্গত। কারণ, রক্ত লাগিয়া পথিকের বস্ত্র নষ্ট হইতে পারে। বরং যবেহ্ করার ও গোশত তৈয়ার করিবার স্থান দোকান-গৃহে নির্ধারিত করিয়া লওয়া উচিত। রাস্তার উপর তরমুজ, খরমুয ইত্যাদি ফলের খোসা ফেলিয়া রাখা, গৃহ হইতে অধিক পানি লোক চলাচলের পথে নিক্ষেপ করা অন্যায়। ইহাতে পথিক পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে।

যে ব্যক্তি রাস্তায় বরফ নিক্ষেপ করে বা যাহার গৃহের পানি রাস্তায় গড়াইয়া যায়, রাস্তা পরিষ্কার করা তাহার কর্তব্য। কিন্তু সমস্ত লোকের গৃহের পানিই রাস্তার উপর দিয়া গড়াইয়া গেলে রাস্তা পরিষ্কার করা তাহাদের সকলের উপর ওয়াজিব এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের দ্বারা রাস্তা পরিষ্কার করাইয়া লওয়া সরকারের দায়িত্ব। লোকে দেখিয়া ভয় পায় এমন কুকুর কাহারও দরজায় রাখা উচিত নহে। রাস্তা নোংরা করা ব্যতীত কুকুর দ্বারা অন্য কোন অসুবিধা না হইলে তদ্রূপ কুকুর রাখিতে নিষেধ করা উচিত নহে। কারণ, এইরূপ নোংরামি হইতে রাস্তা-ঘাট মুক্ত রাখা সম্ভব নহে। কুকুর যদি রাস্তার উপর শয়ন করিয়া চলাচলের পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে, তবে এইরূপভাবে কুকুর বাঁধিয়া রাখাও অসঙ্গত। তদ্রূপ কুকুরের মালিক রশিদ্বারা কুকুরকে বাঁধিয়া ইহাসহ নিজে পথের উপর বসিয়া বা শুইয়া থাকাও অনুচিত।

গোসলখানায় অনুষ্ঠিত মন্দ-কার্য ঃ নাভি হইতে জানু পর্যন্ত স্থানের কোন অংশ অনাবৃত রাখা, কাহারও সম্মুখে উরুদেশ মুক্ত করিয়া ধৌত করা এবং লুঙ্গির ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া অপর কাহারও দ্বারা উরুদেশ ধৌত করানো অবৈধ। কারণ, দর্শন করা, আর স্পর্শ করা একই কথা। গোসলখানার দরজায় প্রাণীর ছবি অঙ্কিত করাও মন্দ কার্য। এইগুলি মুছিয়া ফেলা বা অক্ষম হইলে তথা হইতে নিজে বাহির হইয়া চলিয়া আসা ওয়াজিব। হযরত ইমাম শাফিঈ (র)-র মতে অপবিত্র হাত ও পাত্র অল্প পানিতে ডুবাইয়া দেওয়া অবৈধ। কিন্তু হযরত ইমাম মালিক (র)-র মাযহাব মতে অবৈধ নহে। এইজন্য মালিকী মাযহাবের প্রতিবাদ করা সঙ্গত নহে। গোসলের সময় অতিরিক্ত পানি নষ্ট করাও অন্যায়। এ সম্পর্কে আরও মন্দ কার্য আছে। এগুলি 'পবিত্রতা' অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

মেহমানিতে মন্দ কার্য ঃ রেশমী ফরাস, রৌপের ধূপদান, গোলাবপাশ, আতরদান ও ফুলদান এবং প্রাণীর ছবিবিশিষ্ট পর্দা ব্যবহার করা মন্দ কার্য ও অবৈধ। কিন্তু বালিশে, বিছানায় ছবি থাকিলে ক্ষতি নাই। প্রাণীর আকৃতিতে নির্মিত ধূপদান ব্যবহার

করাও হারাম ও গর্হিত কার্য। মেহমানীর মজলিসে গান-বাদ্যের ব্যবস্থা থাকাও অবৈধ। আবার উহাতে যুবক-যুবতীদের সমাগম হইলে বহু অনর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এ সমস্ত কার্যের শাসন ও প্রতিরোধ ওয়াজিব। অক্ষম হইলে সেই মজলিস বর্জন করতঃ বাহির হইয়া আসিবে। হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বাল (র) এক মাহফিলে রৌপ্যনির্মিত সুরমাদানী দেখিতে পাইয়া উক্ত মাহফিল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে মজলিসে রেশমী বস্ত্র কিংবা স্বর্ণের আংটি পরিহিত কোন লোক থাকিলে এমন মজলিসে বসাই উচিত নহে। বোধসম্পন্ন নাবালেগও উক্ত পোশাকে সজ্জিত থাকিলে তথায় উপবেশন করা উচিত নহে। কারণ, মদ্যপান করা যেমন মুসলমানের জন্য হারাম তদ্রূপ রেশমী বস্ত্র পরিধান করাও পুরুষের জন্য হারাম। নাবালেগকে নিষিদ্ধ পোশাক ব্যবহার করিতে দিলে দোষ এই যে, ইহা পরিধানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে যৌবনেও ইহার লোভ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু অবোধ শিশু যদিও রেশমী বস্ত্রের আস্বাদন উপভোগ ও উপলব্ধি করিতে পারে না তথাপি উহা তাহার জন্য হারাম না ইহলেও মাকরূহ। মাহ্‌ফিলে যদি এমন কোন ভাঁড় উপস্থিত থাকে, যে মিথ্যা ও অশ্লীল বকিয়া বকিয়া লোকদিগকে হাসায়, তবে সেই মজলিসে বসা সঙ্গত নহে।

মোটকথা, সমাজে প্রচলিত মন্দ কার্যসমূহের বিবরণ বহু বিস্তৃত। উপরে যাহা বর্ণিত হইল উহার উপর অনুমান করিয়া তুমি মাদ্‌রাসা, খানকাহ্‌ বিচারালয়, রাজদরবার প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত মন্দ কার্যসমূহ বুঝিয়া লইতে পারিবে।

দশম অধ্যায়

প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন

রাজ্য শাসন একটি মহান কার্য। ন্যায় বিচারের সহিত করিলে ইহা ইহজগতে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতিনিধিত্ব এবং ন্যায় বিচারশূন্য ও করুণাহীন হইলে ইহাই আবার শয়তানের প্রতিনিধিত্ব হইয়া পড়ে। কারণ, শাসকের অবিচার ও অত্যাচার অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারিতা অপর কোন অপকর্মেই নাই। শরীয়তের জ্ঞানলাভ করতঃ তদনুযায়ী রাজ্য শাসন করাই রাজ্যশাসনের মূলনীতি।

রাজ্য শাসন সম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি বিস্তৃত হইলেও ইহার ভূমিকা এই যে, শাসককে সর্বপ্রথম এতটুকু জানিয়া লওয়া আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহাকে এ জগতে কি উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার স্থায়ী বাসস্থান কোথায়। এ জগত তাঁহার পান্থশালা মাত্র; স্থায়ী বাসস্থান নহে বরং মুসাফিরের ন্যায় তিনি ইহলোকে আছেন। মাতৃগর্ভ হইতে সফল আরম্ভ হইয়াছে এবং কবর ইহার শেষ সীমা। এই পথ অতিক্রম করিয়া তাহার বাসস্থান। যে বৎসর, যে মাস ও যে দিন তাঁহার আয়ুষ্কাল হইতে অতিবাহিত হইয়া যায়, উহাদের প্রত্যেকটি তাঁহার ভ্রমণ পথের এক-একটি মন্‌যিলস্বরূপ। এইগুলি অতিক্রম করতঃ তিনি তাঁহার চিরস্থায়ী বাসস্থানের নিকটবর্তী হইতেছেন। যে ব্যক্তি পুল পার হইতে যাইয়া স্বীয় গন্তব্যস্থানের কথা ভুলিয়া পুলের নির্মাণ কার্য দর্শনে সময় নষ্ট করে, সে নিতান্ত নির্বোধ। বরং সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে দুনিয়ারূপ পান্থশালা হইতে পরকালের পাথেয় ব্যতীত আর কিছুই অন্বেষণ করে না এবং যাহা নিতান্ত আবশ্যক তাহা পাইয়াই দুনিয়াতে পরিতুষ্ট থাকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস-পত্র প্রাণসংহারক হলাহলস্বরূপ এবং মৃত্যুকালে উহার অধিকারীর ইচ্ছা হইবে যে, তাহার সমস্ত ধনভাণ্ডার মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ হউক এবং স্বর্ণ-রৌপ্য উহাতে কিছুই না থাকুক। সুতরাং সে যত অধিক ধন-সম্পদই সঞ্চয় করুক না কেন, উহা হইতে কেবল আবশ্যক পরিমাণই তাহার ভোগে আসে; বাকি সমস্তই দুঃখ ও দুশ্চিন্তার বীজ হইয়া দাঁড়ায় এবং মৃত্যুকালে প্রাণ বাহির হওয়ার সময় তজ্জন্য তাহাকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। হালাল উপায়ে অর্জিত মালের দরুনই এই অবস্থা হইবে। আবার হারাম উপায়ে অর্জিত মাল হইলে এতদ্ব্যতীত তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক পরকালীন শাস্তি তো তাহার জন্য নির্ধারিত রহিয়াছেই।

দুঃখ-কষ্ট ভোগ ব্যতীত পার্থিব লোভ-লালসা দমন করা সম্ভব নহে। কিন্তু মানব যদিও এ কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, ইহলৌকিক ক্ষণস্থায়ী আমোদ-আহ্লাদ, ভোগ-বিলাস ভীষণ ক্লেদ ও ক্লেশে পরিপূর্ণ এবং এইজন্য পরকালের চিরস্থায়ী রাজত্ব-সুখ ও অনন্ত অনাবিল শান্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত থাকিতে হইবে তবে পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী লোভ-লালসা দমন করা তাহার জন্য নিতান্ত সহজ হইবে।

উহার দৃষ্টান্ত এইরূপঃ যেমন, এক ব্যক্তি কোন রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়া তাহার মিলন কামনায় অধীর হইয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় যদি তাহাকে বুঝাইয়া বলা যায় যে, তুমি অদ্য রজনী তোমার প্রেয়সীর সহবাস উপভোগ করিলে জীবনে আর কখনও তাহার দর্শনলাভ তোমার ভাগ্যে জুটিবে না; অপরপক্ষে অদ্য রজনী ধৈর্যধারণপূর্বক তাহার সহবাসে বিরত থাকিলে তোমার প্রেয়সীকে হাজার হাজার রজনী প্রতিদ্বন্দ্বীবিহনি নিরঙ্কুশ সহবাসের জন্য তোমার হাতে অর্পন করা হইবে, তবে এই ব্যক্তির মিলনাকাঙ্ক্ষা সীমাহীন ও দুর্দমনীয় হইলেও ভবিষ্যতের হাজার হাজার রজনীর সুদীর্ঘ মিলন-সুখের বাসনায় এই এক রাত্রির বিচ্ছেদ-যাতনা সহ্য করা তাহার জন্য অতি সহজ হইবে। আর পরকালের অনন্ত জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন সহস্রভাগের এক ভাগও নহে। বরং পরলোকের অনন্ত জীবনের সহিত দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের কোন তুলনাই হইতে পারে না।

পরলোকের অনন্ত জীবন যে কত দীর্ঘ, মানুষ তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। কারণ, মনে কর, সপ্ত আস্মান ও সপ্ত যমীনের বিস্তীর্ণ স্থানকে ক্ষুদ্র সরিষা দ্বারা পরিপূর্ণ করত ঃ একটি পাখিকে এইরূপে নিযুক্ত করা হইল যে, ইহা সহস্র বৎসরান্তে একটি করিয়া সরিষা খুটিয়া লইতে থাকিবে, ইহাতেও সমস্ত সরিষা নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তথাপি পরকালের অনন্ত জীবনের কিছুমাত্রও হ্রাস পাইবে না। কাহারও আয়ুষ্কাল যদি একশত বৎসর হয় এবং সমগ্র জগতের নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র আধিপত্য তাহাকে প্রদান করা হয় তথাপি সমগ্র পৃথিবীর উপর তাহার আজীবনের আধিপত্য সুখ পরজগতের অনন্ত রাজ্য সুখের তুলনায় ইহা কত তুচ্ছ ও নগণ্য! অথচ এ জগতে কাহারও ভাগ্যে সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য জুটে না। যত বড় নরপতিই হউক না কেন, পৃথিবীর অতি সামান্য অংশের আধিপত্যই তাহার ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। আবার ইহাও কন্টকশূন্য হয় না; বরং তজ্জন্য সর্বদা উদ্বেগপূর্ণ ও সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। সুতরাং পরলোকের অসীম আনন্দপূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন বাদ্শাহীকে এমন হীন ও আবিলতাপূর্ণ আধিপত্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

অতএব শাসক হউক কিংবা শাসিত হউক, সকলেরই কর্তব্য সর্বদা উপরিউক্ত কথাগুলি গভীরভাবে চিন্তা করা এবং হৃদয়ে এ বিষয়টিকে সর্বদা জাগ্রত রাখা। তাহা হইলেই পার্থিব জীবনের এই কয়েকদিনের লোভ-লালসা দমন করা, প্রজাগণের সহিত

সদয় ব্যবহার করা, আল্লাহ্র বান্দাগণকে সুন্দররূপে প্রতিপালন করা এবং আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করা সহজ হইয়া পড়িবে। এতটুকু উপলব্ধি করার পর মানুষের উচিত আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে রাজ্যশাসন করা এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণে দুনিয়ার সহিত তাল মিলাইয়া রাজদণ্ড পরিচালনা না করা। কারণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও সুবিচারের সহিত রাজ্যশাসন পরিচালনা অপেক্ষা অপর কোন ইবাদতও নৈকট্যই আল্লাহ্র নিকট এত উৎকৃষ্ট ও মহান নহে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ বাদশাহের একদিনের ন্যায় বিচার একাধারে ষাট বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে সাত শ্রেণীর লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র রহমতের ছায়ায় অবস্থান করিবেন বলিয়া হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তি সুবিচারক বাদ্শাহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ন্যায়বিচারক বাদ্শাহের জন্য ফেরেশতাগণ ষাটজন সিদ্দীকের ইবাদতের সমপরিমাণ আমল আসমানে লইয়া যায়। হুযূর (সা) বলেন যে, ন্যায়বিচারক বাদ্শাহ্ আল্লাহ্র অতি নৈকট্যপ্রাপ্ত ও বড় বন্ধু এবং অত্যাচারী বাদশাহ্ আল্লাহ্র ভীষণ শাস্তি ভোগের উপযোগী ও তাঁহার বড় শত্রু। হুযূর (সা) আরও বলেন ঃ সেই আল্লাহ্র শপথ যাঁহার হস্তে মুহম্মদের প্রাণ, সুবিচারক বাদ্শাহের জন্য সমস্ত প্রজার আমলের সমপরিমাণ আমল প্রত্যহ ফেরেশ্তাগণ আস্মানে লইয়া যায় এবং তাহার এক নামায সত্তর হাজার নামাযের সমান।

ন্যায়বিচারের সহিত রাজ্যশাসনের ফযীলত যখন এত অধিক, তখন ইহা অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে বাদ্শাহী প্রদান করিয়াছেন তাহার একঘন্টা অন্যান্য লোকের সারাজীবনের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র এই নিয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি না করিয়া অত্যাচারে ও স্বীয় বাসনা-কামনা চরিতার্থকরণে লিপ্ত হয়, বুঝিতে হইবে যে, তাহার অদৃষ্টে ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে। শাসনকর্তা দশটি নিয়ম পালনে তৎপর হইলেই তাঁহার দ্বারা সুবিচার সম্ভব।

শাসকের পালনীয় নিয়মাবলী ঃ প্রথম নিয়ম ঃ উপস্থিত মুকদ্দমায় বিচারক মনে করিবেন যেন তিনি নিজেই একজন প্রজা এবং অপর কোন ব্যক্তি বিচারক। সুতরাং উপস্থিত মুকদ্দমায় যেরূপ বিচার তিনি নিজের জন্য পছন্দ করেন না, তাহা যেন তিনি অপর মুসলমানের জন্যও পছন্দ না করেন। পছন্দ করিলে তিনি শাসনক্ষমতার অপব্যবহার করত ঃ প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হইবেন। বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছায়ায় উপবিষ্ট এবং সাহাবা কিরাম (রা) রৌদ্রে ছিলেন, এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আপনি ছায়াতে এবং সাহাবাগণ রৌদ্রে! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এতটুকু ব্যাপারেও সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দোযখ হইতে অব্যাহতি পাইতে ও বেহেশ্তে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহার উচিত কালেমা 'লা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহ'

পড়িতে পড়িতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করা এবং যে বস্তু সে নিজের জন্য পছন্দ না করে তাহা অপর মুসলমানের জন্যও পছন্দ না করা। হুযূর (সা) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে স্বীয় হৃদয়কে লিপ্ত করে, সে আল্লাহ্ ভক্ত বান্দা নহে এবং মুসলমানের কাজে ও সেবায় অমনোযোগী থাকে, সে মুসলমান নহে।

দ্বিতীয় নিয়ম ঃ প্রয়োজনে যাহারা আগমন করিয়াছে, তাহাদিগকে অযথা নিজ দ্বারে প্রতীক্ষমান রাখাকে তুচ্ছ কার্য বলিয়া মনে করিবেন না এবং এইরূপ করার বিপদ হইতে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিবেন। উপস্থিত কোন মুসলমানের কাজ বাকি রাখিয়া কোন নফল ইবাদতে লিপ্ত হইবেন না। কারণ, মুসলমানের অভাব-অভিযোগ পূরণ করা সমস্ত নফল ইবাদত হইতে উত্তম।

একদা হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) জুহরের সময় পর্যন্ত প্রজাদের কার্যে ব্যস্ত থাকিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এরবং সামান্য বিশ্রামের জন্য নিজ গৃহে গমন করিলেন। তখন তাঁহার পুত্র বলিলেন ঃ কি কারণে আপনি নিশ্চিত হইলেন? অসম্ভব নহে যে, এখনই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে এবং ইত্যবসরে অভাব-অভিযোগ লইয়া কোন ব্যক্তি আপনার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। এমতাবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে আপনার কর্তব্যে ক্রটি থাকিয়া যাইবে। তিনি বলিলেনঃ তুমি ঠিক বলিয়াছ। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তৃতীয় নিয়ম ঃ প্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া এবং উত্তম খাদ্য ভোজনে ও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত হওয়া শাসকের উচিত নহে। বরং সর্ব বিষয়ে অল্পে পরিতুষ্ট হওয়া আবশ্যক। কারণ, অল্পে পরিতুষ্ট না হইলে সুবিচার করা সম্ভব নহে। হযরত উমর (রা) হযরত সাল্মান ফারসী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমার সম্বন্ধে আপনার অপছন্দনীয় কি কথা শ্রবণ করিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ আমি শুনিয়াছি, আপনার দস্তরখানে একই সময়ে দুই প্রকার ব্যঞ্জন উপস্থিত থাকে এবং আপনি দুইটি পিরহান রাখিয়া থাকেন-একটি রাত্রে ও অপরটি দিনে পরিধানের জন্য। হযরত উমর (রা) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা, ইহাছাড়া আরও কিছু শুনিয়াছেন কি? তিনি উত্তর করিলেন ঃ না। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ এই দুইটি কথাই মিথ্যা।

চতুর্থ নিয়ম ঃ প্রত্যেক কার্যে যথাসাধ্য নম্র ব্যবহার করিবেন, কঠোরতা অবলম্বন করিবেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে শাসক প্রজাদের সহিত নম্র ব্যবহার করে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাহার সহিত নম্র ব্যবহার করিবেন। আর হুযূর (সা) দু'আ করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! যে শাসক প্রজাদের সাথে নম্র ব্যবহার করে, তুমি তাহার সহিত নম্র ব্যবহার কর এবং যে ব্যক্তি কঠোর ব্যবহার করে, তুমিও তাহার সহিত

কঠোর ব্যাবহার কর। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে শাসক শাসন কার্যের দায়িত্ব পালন করে, তাহার জন্য শাসনকার্য উত্তম কাজ। আর যে ব্যক্তি দায়িত্ব পালনে ক্রটি করে, তাহার জন্য শাসনকার্য মন্দ।

খলীফা হিশাম ইব্নে আবদুল মালিক শ্রেষ্ঠ আলিম হযরত আবূ হাযেম (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ শাসনকার্যের গুরু দায়িত্ব হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় কি? তিনি উত্তর করিলেন ঃ উপায় এই যে অর্থ তুমি গ্রহণ কর তাহা হালাল মাল হইতে গ্রহণ কর এবং যে অর্থ তুমি ব্যয় কর তাহা এমন স্থানে ব্যয় কর যে স্থানে ব্যয় করা সঙ্গত। খলীফা বলিলেন ঃ ইহা কি কেহ করিতে পারে? তিনি বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি কবরের আযাব সহ্য করিতে অক্ষম এবং বেহেশতে প্রবেশের জন্য উদ্গ্রীব, সে ইহা করিতে পারে।

পঞ্চম নিয়ম ঃ শরীয়ত অনুযায়ী সকল প্রজাই যেন তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, শাসনকর্তা এই চেষ্টা করিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ শাসকগণের মধ্যে তাঁহারাই উত্তম যাঁহারা তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমরাও তাঁহাদিগকে ভালবাস। আর যে শাসক তোমাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করেন এবং তোমারও তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া থাক, এইরূপ শাসনকর্তা শাসকদের মধ্যে নিকৃষ্টতম।

লোকে প্রশংসা করিলে শাসনকর্তার গর্বিত হওয়া সঙ্গত নহে এবং এইরূপ মনে করাও উচিত নহে যে, সকলেই তৎপ্রতি সন্তুষ্ট। হয়ত ভয়ের কারণে সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে। বরং বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করত ঃ নিজের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভাব গোপনে অনুসন্ধানপূর্বক জানিয়া লওয়া শাসকের কর্তব্য। কারণ, মানুষ স্বীয় দোষ-ক্রটি লোক মুখেই জানিতে পারে।

ষষ্ঠ নিয়ম ঃ শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শাসক কাহারও সন্তুষ্টিলাভের চেষ্টা করিবেন না। কারণ, শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়, তাহার অসন্তুষ্টি শাসকের কোনই ক্ষতি করে না। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ প্রত্যুষে যখন আমি গাত্রোত্থান করি তখন অর্ধেক লোক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ অবশ্যই ঘটিবে। কারণ, শাসক অত্যাচারীকে শাস্তি দিলে সে তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হইবে। সুতরাং বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। যে ব্যক্তি লোকের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বর্জন করে, সে নিতান্ত বোকা।

হযরত মুআবিয়া (রা) হযরত আয়েশা (রা) নিকট এক পত্র দ্বারা সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। হযরত আয়েশা (রা) উত্তরে লিখিলেন ঃ আমি সৃষ্টির সেরা জনাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি , যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য না করিয়া আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ্ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং মানুষকে

তাহার প্রতি সন্তুষ্ট করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য না করিয়া মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ্ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট করিয়া দেন।

সপ্তম নিয়ম ঃ শাসনকর্তার উপলব্ধি করা উচিত যে, রাজ্য শাসন একটি বিপদসঙ্কুল কার্য এবং মানব জাতির শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার নহে। আল্লাহ্ যাহাকে ইহার দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা অর্পণ করেন তিনি এমন সৌর্ভাগ্য লাভ করেন যাহার তুলনায় শ্রেষ্ঠতর সৌভাগ্য আর কিছুই নাই। আর যে ব্যক্তি শাসন-কার্যে ত্রুটি করে, সে এমন দুর্ভাগ্যে নিপতিত হয় যে, কুফরের পর এমন দুর্ভাগ্য আর হইতে পারে না।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিলাম তিনি আগমন করতঃ কা'বা শরীফের বেষ্টনী ধারণ করিলেন এবং তখন কুরায়শগণ হেরেম শরীফে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, যে পর্যন্ত তিনটি কার্য করিবে সে পর্যন্ত কুরায়শ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে শাসনকর্তা ও বাদশাহ্ হইতে থাকিবে। কেহ তোমাদের নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হইলে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবেঃ বিচারপ্রার্থী হইলে ন্যায়বিচার করিবে; অঙ্গীকার করিলে তাহার পূর্ণ করিবে। যে ব্যক্তি এইগুলি না করে তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র ফেরেশেতাগণের ও সকলের অভিশাপ বর্ষিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তাহার ফরয-সুন্নত, কোন ইবাদতই কবূল করেন না। অতএব, ভাবিয়া দেখা কর্তব্য যে, এই তিনটি কার্য না করা কত বড় গুরুতর পাপ যদ্দরুণ আল্লাহ্ তাহার কোন ইবাদতই কবূল করেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুইজন লোকের বিচার করে, আর (ইহাতে) অন্যায় করে, তাহার উপর আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন। হুযূর (সা) বলেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে দৃষ্টিপাতও করিবে না। (১) মিথ্যাবাদী সুলতান (শাসকর্তা বা বাদশাহ্), (২) ব্যভিচারী বৃদ্ধলোক; (৩) গর্বিত ও দর্পকারী দরিদ্র ব্যক্তি। তৎপর হুযূর (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে বলিলেন ঃ অতি সত্বর পূর্ব-পশ্চিমের রাজ্য তোমাদের দখলে আসিবে এবং তথাকার শাসনকর্তাগণ দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, পরহিযগারী অবলম্বন করিবে এবং আমানতদার হইবে (তাহারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে না)। হুযূর (সা) আরও বলেন ঃ যে শাসনকর্তার উপর আল্লাহ্ প্রজাপালনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে সস্নেহে এবং প্রজাপালন না করে তবে আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম করিয়া দিবেন। হুযূর (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ যাহাকে মুসলমানগণের উপর নেতৃত্ব দান করিয়াছেন সে যদি তাহাদিগকে নিজের পরিবার-পরিজনের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ না করে তবে তাহাকে বলিয়া দাও সে যেন

নিজের বাসস্থান দোযখে অনুসন্ধান করিয়া লয়। হুযূর (সা) বলেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে দুই প্রকার লোক আমার শাফায়াত হইতে বঞ্চিত থাকিবে ঃ (১) অত্যাচারী বাদ্‌শাহ; (২) যে বিদ্‌আতী ধর্ম-বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি করিয়া সীমা অতিক্রম করে। হুযূর (সা) বলেন ঃ অত্যাচারী বাদশাহের উপর কিয়ামতের দিন ভীষণ আযাব হইবে।

হুযূর (সা) বলেন ঃ পাঁচ প্রকার লোকের প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট। তিনি ইচ্ছা করিলে দুনিয়া হইতেই তাহাদের উপর শাস্তি আরম্ভ করেন। অন্যথায় তাহাদের জন্য তো দোযখে স্থান অবধারিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম, সম্প্রদায়ের আমীর (শাসক) যে অধীনস্থ লোকদের নিকট হইতে নিজের প্রাপ্য আদায় করিয়া লয়, কিন্তু তাহাদের প্রতিদান দেয় না এবং তাহাদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করে না। দ্বিতীয়, এমন নেতা লোকে যাহার অনুসরণ করিয়া থাকে কিন্তু সে সবল-দুর্বলকে এক নজরে দেখে না; বরং (সবলের) পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকে। তৃতীয়, যে ব্যক্তি (মজুরী প্রদানের অঙ্গীকারে) শ্রমিক নিযুক্ত করে কিন্তু শ্রমিক তাহার কার্য সামাধা করিয়া দেওয়ার পরও তাহাকে মজুরী দেয় না। চতুর্থ, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানিয়া চলিবার জন্য আদেশ করে না এবং তাহাদিগকে ধর্মের বিধান শিক্ষা দেয় না ও তাহাদের আহার কোথা হইতে দিবে সে চিন্তা করে না। পঞ্চম, যে ব্যক্তি মাহরের ব্যাপারে নিজের স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করে।

হযরত উমর (রা) একদা জানাযার নামায পড়াইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া নামায পড়াইয়া দিলেন। দাফনের পর কবরের উপর হাত রাখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! পাপের দরুন যদি এই মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান কর তবে তাহা উপযুক্তই হইবে। আর তুমি যদি তাহার প্রতি রহমত বর্ষণ কর তবে সে তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী। হে মৃত ব্যক্তি! তুমি কখনও আমীর (শাসক) ছিলে না, সরকারী ঘোষণাকারী বা তাহার সাহায্যকারী ছিলে না, দলীল লেখক বা তহ্‌শীলদারও ছিলে না। অতএব, শান্তিতে অবস্থান কর। এই বলিয়া সেই ব্যক্তি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির কর। কিন্তু তাঁহাকে আর পাওয়া গেল না। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ তিনি ছিলেন হযরত খিযির আলায়হিস সালাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমীর (শাসক), নকীব (সরকারী ঘোষণাকারী) ও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি আফসোস। কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে তাহাদের কেশগুচ্ছ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইবে। কারণ, তাহারা কখনই তাহাদের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করিত না। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্তত ঃ দশজন লোকের উপরও শাসন ক্ষমতা লাভ করে, কিয়ামতের দিন তাহাদের হস্ত শিকল দ্বারা

বাঁধিয়া তাহাকে আনয়ন করা হইবে। সে যদি নেককার হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকে তবে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে। অন্যথায় আরও একটি শিকল দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া দেওয়া হইবে।

হযরত উমর (রা) বলেন যে, মহাবিচারক আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে দুনিয়ার শাসকবৃন্দের যে দুর্গতি ঘটিবে তাহা বড়ই আফসোসের বিষয়। কিন্তু যাহারা সুবিচার করিয়াছে, নিজের দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করিয়াছে, লোভের বশীভূত হইয়া কোন রায় প্রদান করে নাই, আত্মীয়-স্বজনের পক্ষপাতিত্ব করে নাই; বরং ভয় বা লোভের বশীভূত হইয়া কোন হুকুমের পরিবর্তন করে নাই; বরং আল্লাহ্‌র কিতাবকে দর্পণের ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া তদনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছে, তাহাদের কোন দুর্গতি হইবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিবস শাসকদিগকে আহ্‌কামুল হাকিমীন আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির করিয়া বলা হইবে ঃ তোমরা আমার বকরীসমূহের রাখাল ছিলে (অর্থাৎ আমার নিরীহ দুর্বল বান্দাগণের শাসনভার তোমার উপর অর্পিত ছিল) এবং তোমরা আমার জগত রাজ্যের রাজকোষসমূহের কোষাধ্যক্ষ ছিলে। আমার বিধানের অতিরিক্ত দণ্ড ও শাস্তি তাহাদিগকে কেন দিলে ? তাহারা নিবেদন করিবে ঃ হে মহাবিচারক আল্লাহ্! তাহারা আপনার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের প্রতি আমাদের ক্রোধের কারণ। আল্লাহ্ বলিবেন ঃ কেন তোমাদের ক্রোধ কি আমার ক্রোধ অপেক্ষা অধিক ছিল ? অপর এক দল শাসককে আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেনঃ তোমরা আমার বিধান অপেক্ষা কম শাস্তি দিলে কেন ? তাহারা নিবেদন করিবে ঃ হে বিশ্ব প্রভু! আমরা তাহাদের প্রতি দয়া করিয়াছিলাম। আল্লাহ্ বলিবেন ঃ কেন, তোমরা কি আমা হইতে অধিক দয়ালু ছিলে ? তৎপর অধিক শাস্তি ও কম শাস্তি প্রদানকারী উভয় দলকে ধৃত করা হইবে এবং দোযখের কোণসমূহ তাহাদের দ্বারা পূর্ণ করা হইবে।

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ শাসনকর্তা সৎই হউক, আর অসৎই হউক, আমি তাহাদের কাহারো প্রশংসা করি না। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, কিয়ামত দিবস ন্যায়বিচারক ও অত্যাচারী সকল শাসককে একত্র করিয়া পুলসিরাতের উপর দণ্ডায়মান করা হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা পুলসিরাতকে নির্দেশ দিবেন-একবার তাহাদিগকে ঝাঁকি দাও। যাহারা বিচার-মীমাংসায় অন্যায় করিয়াছিল অথবা ঘুষ গ্রহণ করিয়া অন্যায় বিচার করিয়াছিল কিংবা এক পক্ষের কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়াছিল (এবং অপর পক্ষের কথা শ্রবণ করে নাই) তাহারা সকলেই (এই ঝাঁকিতে পুলের উপর হইতে)

দোযখে পতিত হইবে এবং সত্তর বৎসর ধরিয়া পড়িতে পড়িতে দোযখের গভীরতম গহ্‌বরে যাইয়া ঠেকিবে। উহাই তাহাদের বাসস্থান হইবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আ) ছদ্মবেশে বাহির হইতেন এবং যাহার সহিত সাক্ষাত হইত তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন ঃ ভ্রাতঃ বল তো দাউদের স্বভাব কিরূপ ? একদা হযরত জিব্রাঈল (আ) মানুষের আকৃতি ধারণ করতঃ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকেও তদ্রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ দাউদ (আ) যদি বায়তুল মাল হইতে নিজের ভরণ-পোষণ গ্রহণ না করিয়া নিজের অর্জিত ধনে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন তবে তিনি ভাল লোকই বটে। ইহা শুনিয়া হযরত দাউদ (আ) স্বীয় ইবাদতখানায় গমন করিলেন এবং রোদন করিতে করিতে মুনাজাত করিতে লাগিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমাকে এমন কোন শিল্পকর্ম শিক্ষা দিন যদ্বারা আমি স্বহস্তে উপার্জিত ধনে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারি। আল্লাহ্ তাঁহাকে লৌহ-বর্ম নির্মাণকার্য শিখাইয়া দিলেন।

হযরত উমর (রা) চৌকিদারের পরিবর্তে স্বয়ং রাত্রিকালে শহরে টহল দিতেন যেন কোন স্থানে কোন প্রকার ঝগড়া-ফাসাদ দেখিতে পাইলে উহা নিবারণ করিতে পারেন এবং তিনি বলিতেন ঃ লোকে যদি চর্মরোগ বিশিষ্ট একটি ছাগকে ফোরাত নদীর তীরে একাকী অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া আসে এবং দেহে তৈল মর্দন না করার দরুন ছাগটি কষ্ট পায়, তবে আমার আশঙ্কা হয় কিয়ামত দিবস তজ্জন্যও আমাকে জবাবদিহী করিতে হইবে। যদিও উমর (রা) প্রজাপালন বিষয়ে এত সামান্য ব্যাপারের প্রতিও এমন কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করিতেন এবং তাঁহার সুবিচার এত উচ্চস্তরের ছিল যে, কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। তথাপি তাঁহার ইন্তিকালের পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর ইব্‌নে আস (রা) বলেন ঃ আমি হযরত উমর(রা) কে স্বপ্নে দেখিবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিতাম। বার বৎসর পর স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি যেন এইমাত্র গোসল করিয়া লুঙ্গি পরিধান পূর্বক আমার নিকট আগমন করিয়াছেন। আমি নিবেদন করিলাম ঃ ইয়া আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন ? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে আবদুল্লাহ্! আমি তোমার নিকট হইতে আসিয়াছি কতদিন হইল ? আমি বলিলাম ঃ বার বৎসর। তিনি বলিলেন ঃ এতদিন আমি হিসাব -নিকাশে ব্যস্ত ছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি রহমত না করিলে আমার সর্বনাশ হইত। অথচ হযরত উমর (রা)-এর নিকট শাসনকার্যের উপকরণের মধ্যে একটি দুর্রা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

পারস্য সম্রাট হযরত উমর (রা)-এর আকৃতি প্রকৃতি দেখিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। দূত মদীনা শরীফ পৌঁছিয়া মুসলমানগণকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনাদের বাদশাহ কোথায় ? তাঁহারা বলিলেন ঃ আমাদের বাদশাহ নাই। আমাদের একজন

আমীর আছেন। তিনি অল্পক্ষণ হয় বাহিরে গিয়াছেন। দূত বাহিরে যাইয়া দেখিতে পাইল যে, হযরত উমর (রা) মুক্ত প্রান্তরে রৌদ্রে দুর্রা শিয়রে দিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন এবং নূরানী চেহারা হইতে ঘাম বাহির হইয়া মাটি ভিজিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া দূত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। নিখিল বিশ্বের সমস্ত রাজা -বাদশাহ্ যাঁহার প্রতাপে ভীত ও সন্ত্রস্ত রহিয়াছে, তাঁহার এই অবস্থা! তৎপর দূত নিবেদন করিল ঃ হে, আমীরুল মুমিনীন ! আপনি ন্যায়বিচার করিয়াছেন। এইজন্যই আপনি নিঃশংকচিত্তে নিদ্রা যাইতেছেন। আর আমাদের রাজা-বাদ্শাহগণ অত্যাচার করে। সুতরাং তাঁহারা উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত থাকিতে বাধ্য। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনাদের ধর্ম সত্য। দূতরূপে আগমন না করিয়া থাকিলে আমি এখনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতাম। পুনরায় আসিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইব।

মোটকথা, শাসনকার্যের বিপদসমূহের সামান্য বর্ণনা উপরে প্রদত্ত হইল। এ বিষয়ের জ্ঞান বহু বিস্তৃত। শাসনকর্তার কর্তব্য, সর্বদা ধর্মপরায়ণ অভিজ্ঞ আলিমগণের সংসর্গ লাভ করা, তাঁহাদের নিকট হইতে সুবিচারের সহিত প্রজাপালন ও রাজ্য-শাসনের পদ্ধতি অবগত হওয়া এবং সর্বদা তদনুযায়ী আমল করিবার জন্য সচেষ্ট থাকা। তাহা হইলে তাহারা অব্যাহতি পাইতে পারে। আর ধোকাবাজ আলিমগণের সংসর্গ তাহাদের বর্জন করা উচিত। কারণ, ধোকাবাজ আলিম শয়তানস্বরূপ।

অষ্টম নিয়ম ঃ সর্বদা ধর্মপ্রাণ অভিজ্ঞ আমিলের সাক্ষাতলাভের জন্য উদ্গ্রীব থাকা এবং তাঁহাদের উপদেশ অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা ও সংসারাসক্ত লোভী আলিমের সংসর্গ সতর্কতার সহিত বর্জন করিয়া চলা; কারণ সংসারাসক্ত আলিম শাসনকর্তাকে প্রতারিত করিবে, তাঁহার প্রশংসা করিবে এবং তাঁহার মন যোগাইয়া চলিবে যেন তাঁহার হস্তস্থিত মৃতদেহ অর্থাৎ পার্থিব ভোগ-বিলাসের সামগ্রী হইতে চাতুরী-বাহানা করিয়া কিছু লাভ করিতে পারে। যে আলিম রাজা-বাদ্শাহের নিকট হইতে কোন কিছুর প্রত্যাশা করেন না, দোষ-ত্রুটি দেখিলে তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে ভয় করেন না এবং সর্বদা ন্যায়-নীতি পালন করিয়া চলেন তিনিই ধর্ম-পরায়ণ আলিম।

হযরত শফীক বলখী (র) খলীফা হারুনুর-রশীদের নিকট উপস্থিত হইলে খলীফা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে শফীক! আপনি কি সংসারবিরাগী দরবেশ ? তিনি বলিলেন ঃ আমি শফীক, দরবেশ নহি। খলীফা বলিলেন ঃ আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আসনে আসন দান করিয়াছেন। এখন তিনি তোমার নিকট হইতে তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ততা, সত্যনিষ্ঠতা ও অকপটতা দেখিতে ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে

হযরত উমর ফারুক (রা)-র আসনে বসাইয়াছেন। আল্লাহ্ যেমন তাঁহার নিকট হইতে সত্য ও অসত্যের পার্থক্যকরণ চাহিয়াছিলেন, তোমার নিকট হইতেও তিনি তদ্রূপ আশা করেন। আল্লাহ্ তোমাকে হযরত উস্মান যুন্-নূরায়ন (রা)-র আসনে স্থান দান করিয়াছেন। এখন তিনি তোমার নিকট হইতে তাঁহার ন্যায় লজ্জাশীলতা ও বদান্যতা আশা করেন। আল্লাহ্ তোমাকে হযরত আলী (রা)-র স্থানে আসন দান করিয়াছেন। এখন তিনি তোমার নিকট হইতে তাঁহার ইল্ম ও সুবিচার প্রত্যাশা করেন। খলীফা আরও উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা 'দোযখ' নামক একটি স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তোমাকে ইহার দারোয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন ও তোমাকে তিনটি বস্তু দান করিয়াছেন ঃ (১) সরকারী কোষাগারের ধন, (২) তলওয়ার ও (৩) বেত্রদণ্ড। আর এই তিনটির সাহায্যে প্রজাবৃন্দকে দোযখ হইতে রক্ষা করিবার নির্দেশ তিনি তোমাকে প্রদান করিয়াছেন। অভাবগ্রস্ত তোমার নিকট আসিলে তাহাকে সেই ধন হইতে বঞ্চিত রাখিও না; যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানী করে, তাহাকে বেত্রদণ্ড দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবে এবং অন্যায়ভাবে কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে নিহত ব্যক্তির ওলীর অনুমতিক্রমে হত্যাকারীকে তলওয়ার দ্বারা হত্যা করিবে। এইরূপ না করিলে তোমাকেই সর্বাগ্রে দোযখে প্রবেশ করিতে হইবে। অপরাপর লোক তোমার পিছনে দোযখে প্রবেশ করিবে। খলীফা আরও উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন ঃ তুমি একটি ঝরণাস্বরূপ এবং তোমার কর্মচারীবৃন্দ ইহা হইতে উদ্ভূত নদী-নালা সদৃশ। ঝরণাটি স্বয়ং নির্মল থাকিলে ইহা হইতে নিঃসৃত নদী-নালার মলিনতা কোন ক্ষতি করিতে পারে না কিন্তু স্বয়ং ঝরণাটি মলিন ও অপরিষ্কার হইয়া পড়িলে নদী-নালাসমূহ পরিষ্কার থাকিবে এইরূপ আশা করা উচিত নহে।

খলীফা হারুনুর-রশীদ তাঁহার অন্যতম সহচর আব্বাসকে সঙ্গে লইয়া হযরত ফুযায়ল ইয়ায (র)-র সাক্ষাত করিতে গেলেন। তাঁহারা যখন তাঁহার গৃহদ্বারে পৌঁছিলেন তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّئٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ط سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ-

তাহারা যে মন্দ কার্য করিতেছে, তাহারা কি ধারণা করে যে, আমি তাহাদিগকে সেই সমস্ত লোকের সমকক্ষ রাখিব যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং নেককার্য করিয়াছে, যাহার ফলে তাহাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হইয়া পড়িবে ? তাহারা ইহা অন্যায় দাবি করিতেছে।

এই আয়াত শুনিয়া হারুনুর -রশীদ বলিলেন ঃ আমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহিলে এই আয়াতই আমাদের জন্য যথেষ্ট। খলীফা অতঃপর আব্বাসকে দ্বারে

খট্‌খটি দিতে বলিলেন। আব্বাস দরজায় খট্‌খটি দিয়া বলিলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন আসিয়াছেন; দরজা খুলুন। হযরত ফুযায়ল (র) গৃহের ভিতর হইতে বলিলেন ঃ আমার নিকট তাহার কি প্রয়োজন ? আব্বাস বলিলেন ঃ আমীরুল মুমিনীনের মর্যাদা রক্ষা করুন। তখন তিনি দরজা খুলিলেন ঃ তখন রাত্রিকাল ছিল; কিন্তু তিনি প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া দিলেন। মুসাফাহা করিবার জন্য হারুনুর -রশীদ অন্ধকারেই স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিলেন। হযরত ফুযায়লও স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিলেন। উভয় হস্ত মিলিত হইলে হযরত ফুযায়ল (র) বলিলেন ঃ এমন কোমল হস্ত দোযখ হইতে রক্ষা না পাইলে বড়ই আফসোসের বিষয়। তৎপর তিনি বলিলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! কিয়ামত দিবস আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহীর জন্য প্রস্তুত থাকুন। কারণ, সেই দিন তোমাকে প্রত্যেক মুসলমানের সহিত এক একবার দাঁড় করাইয়া তাহাদের সম্বন্ধে তোমার বিচার করিবেন। ইহা শুনিয়া খলীফা কাঁদিতে লাগিলেন। আব্বাস বলিলেন ঃ হে মহাত্মন! চুপ করুন; আপনি তো খলীফাকে মারিয়াই ফেলিলেন। হযরত ফুযায়ল (র) বলিলেন ঃ হে হামান! তুমি এবং তোমার সঙ্গীরাই খলীফাকে ধ্বংস করিয়া রাখিয়াছ। অথচ আমাকে বলিতেছ যে, আমি তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি। হারুনুর-রশীদ আব্বাসকে বলিলেন ঃ তিনি আমাকে ফিরাউনের ন্যায় মনে করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি তোমাকে 'হামান' নামে সম্বোধন করিলেন। তৎপর হযরত ফুযায়ল (র)-র সম্মুখে সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা হাদিয়াস্বরূপ স্থাপনপূর্বক খলীফা বলিলেন ঃ হুযূর! এই মুদ্রাগুলি হালাল। উত্তরাধিকারসূত্রে উহা আম্মার মাহর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। হযরত ফুযায়ল (র) বলিলেন ঃ আমি তোমাকে বলিয়া দিতেছি যে, তোমার নিকট যে সমস্ত ধন-সম্পদ রহিয়াছে তাহা হইতে তোমার হাত গুটাইয়া ফেল এবং তন্মধ্যে যাহার যতটুকু অধিকার আছে, তাহাকে ততটুকু প্রদান কর। কিন্তু তুমি আমাকে দিতেছ! অনন্তর তাঁহার দরবার হইতে খলীফা বাহির হইয়া পড়িলেন।

খলীফা হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র) একদা হযরত ইব্‌ন কাআব করযীকে বলিলেন ঃ সুবিচার কাহাকে বলে, আমাকে বুঝাইয়া দিন। তিনি বলিলেন ঃ তোমা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ মুসলমানগণের নিকট পিতৃতুল্য থাকিবে, তোমার সমবয়স্কদিগকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করিবে এবং প্রত্যেক অপরাধীকে তাহার অপরাধের পরিমাণ ও তাহার ক্ষমতার উপযোগী শাস্তি দিবে। সাবধান, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া কাহাকেও অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করিও না। অন্যথায় তোমার স্থান দোযখে হইবে।

এক দরবেশ এক খলীফার দরবারে গমন করিলে খলীফা নিবেদন করিলেন, আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন ঃ আমি চীন শহরে গিয়াছিলাম। তথাকার বাদ্‌শাহ বধির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিতেন ঃ আমি যে শুনিতে পাই না তজ্জন্য আমি রোদন করি না: বরং আমি এইজন্য রোদন করিতেছি যে, কোন

মযলুম ব্যক্তি যদি আমার দ্বারে উপস্থিত হয় তবে আমি তাহার অভিযোগ শুনিতে পাইব না। কিন্তু আমার দৃষ্টিশক্তি বিদ্যমান আছে। রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দাও যেন বিচার প্রার্থী ব্যক্তি লাল বর্ণের বস্ত্র পরিধান করে। তদবধি বাদ্‌শাহ প্রত্যহ হস্তী পৃষ্টে আরোহণ করতঃ নগর প্রদক্ষিণে বাহির হইতেন এবং লাল বর্ণের বস্ত্র পরিহিত লোক দেখিবামাত্র তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার অভিযোগের যথাযথ বিচার করিয়া দিতেন। তৎপর দরবেশ বলিলেন ঃ হে খলীফা! এই বাদশাহ কাফির ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাগণের প্রতি তাঁহার এইরূপ দয়া ছিল। তুমি মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারস্থ লোক। অতএব, ভাবিয়া দেখ, প্রজাদের প্রতি তোমার কি পরিমাণ দয়া হওয়া আবশ্যক।

হযরত আবূ কলাবাহ্ (র) খলীফা হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র)-র দরবারে গমন করিলে খলীফা নিবেদন করিলেন ঃ আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন ঃ হযরত আদম (আ)-র সময় হইতে আজ পর্যন্ত যত খলীফা ছিলেন সকলেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন; কেবল তুমি জীবিত আছ। খলীফা বলিলেন ঃ আরও কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন ঃ এখন যে খলীফা সর্বাগ্রে পরলোক গমন করিবে, সে খলীফা তুমি। খলীফা আরও উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ যদি তোমার সঙ্গে থাকেন তবে কিসের ভয় ? আর তিনি তোমার সঙ্গে না থাকিলে তুমি কাহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? খলীফা বলিলেন ঃ এতটুকু উপদেশই আমার জন্য যথেষ্ট।

খলীফা সুলায়মান আবদুল মালিক একদা চিন্তা করিতে লাগিলেন ঃ আমি এত সুখ-শান্তি উপভোগ করিয়াছি যে, কিয়ামত-দিবস আমার কি অবস্থা হয়, তাহাই ভাবিবার বিষয়। তৎকালীন বুযর্গ আলিম হযরত আবূ হাযেম (র)-এর নিকট তিনি লোক পাঠাইয়া প্রার্থনা জানাইলেন ঃ আপনি যে বস্তু দ্বারা ইফ্‌তার করিয়া থাকেন তাহা হইতে সামান্য কিছু আমার জন্য পাঠাইতে মর্যী ফরমাইবেন। গমের কিছু ভূসি ভাজিয়া তিনি খলীফাকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে সেই লোক মারফত জানাইলেন ঃ রাত্রিকালে আমি ইহাই খাইয়া থাকি। ইহা দেখিয়া খলীফা সুলায়মান খুব রোদন করিলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িল এবং তিনি উপর্যুপরি তিনটি রোযা রাখিলেন ও এই সময়ের মধ্যে কিছুই আহার করিলেন না। তৃতীয় দিবসে সেই ভাজা ভূসি দ্বারাই ইফতার করিলেন। উক্ত রাত্রিতে খলীফা সুলায়মান আবদুল মালিক স্বীয় স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে আবদুল আযীয জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার ঔরসেই ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র) জন্মগ্রহণ করেন যিনি প্রজাপালন ও ন্যায়বিচারে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) পদাংক অনুসরণ করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। বুযুর্গগণ বলেন যে, খলীফা সুলায়মান আবদুল

মালিক পবিত্র নিয়্যতে উল্লিখিত বুযর্গ আলিমের ইফতারের বস্তু হইতে আহারের বরকতেই এমন পুত্রলাভ করিয়াছিলেন।

খলীফা হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি তওবা করেন কেন ? তিনি বলিলেন ঃ একদা আমি এক গোলামকে প্রহার করিতেছিলাম এমন সময় সে বলিতে লাগিল হুযূর! সেই রাত্রির কথা স্মরণ করুন যাহার অবসান ঘটিলেই কিয়ামত হইবে। তাহার এই কথা আমার অন্তরে বসিয়া গিয়াছে।

খলীফা হারুনুর -রশীদ নগ্নপদে অনাবৃত মস্তকে উত্তপ্ত বালুকা ও প্রান্তরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া হস্ত উত্তোলনপূর্বক উচ্চস্বরে প্রার্থনা করিতেছিলেন ঃ হে করুণাময় আল্লাহ্! তুমি তো সীমাহীন দয়ার সিন্ধু, আর আমি সেই পাপী যাহার কার্য প্রতি মূহূর্তে পাপ করা, আর প্রতি মুহূর্তেই তুমি তাহা ক্ষমা করিয়া থাক। আমার প্রতি দয়া কর। এক বুযর্গ এই দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন ঃ দেখ, ইহলোকের প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ্ উভয়লোকের সর্বশক্তিমান বাদশাহের নিকট কেমন কাতরকণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন। হযরত উমর ইব্‌নে আবুল আযীয (র) হযরত আবু হাযেম (র)-র নিকট কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন ঃ মাটিতে শয়ন করিবে, মৃত্যুকে শিয়রে রাখিবে এবং তোমার যে বদ্ধমূল ধারণা কখন মৃত্যু আসিয়া পড়ে, এই ধারণা সর্বদা তোমার অন্তরে জাগ্রত রাখিবে। আর যে বস্তু তুমি পছন্দ কর না, তাহা হইতে দূরে থাকিবে। কারণ, মৃত্যু খুব নিকটে থাকাই সম্ভব।

অতএব, উপরিউক্ত কাহিনীসমূহ সর্বদা নিজের চক্ষুর সম্মুখে রাখা বিচারক ও শাসকের কর্তব্য এবং যে সমস্ত উপদেশ অন্যান্য শাসকের জন্য উপরে বর্ণিত হইয়াছে উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করা প্রত্যেক শাসক ও বিচারকের কর্তব্য। আর কোন আলিমের সাক্ষাত পাইলেই তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ প্রার্থনা করা উচিত। আবার আলিমেরও কর্তব্য কোন শাসক ও বিচারককে দেখামাত্র তদ্রূপ উপদেশ প্রদান করা এবং সত্য গোপন না করা। তোষণ-নীতি অবলম্বন পূর্বক যে ব্যক্তি শাসকদের অহংকার বাড়াইয়া তোলে এবং তাহাদের নিকট সত্য কথা গোপন রাখে, এই শাসকের দ্বারা দুনিয়াতে যে সমস্ত অত্যাচার ও অবিচার অনুষ্ঠিত হইবে, সে ব্যক্তিও এই অত্যাচার ও অবিচারের অংশী হইবে।

নবম নিয়ম ঃ শাসনকর্তা কেবল স্বয়ং অত্যাচার হইতে বিরত থাকিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না; বরং নিজের চাকর-নওকর, কর্মচারী ও প্রতিনিধিগণকেও সংশোধন করিবেন এবং তাহাদের অত্যাচার -উৎপীড়নে শাসনকর্তা কখনই সন্তুষ্ট থাকিবেন না। কারণ, তাহারা যে অত্যাচার ও অবিচার করিবে, তজ্জন্যও শাসনকর্তাকে আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহী করিতে হইবে।

হযরত উমর (রা) প্রাদেশিক শাসনকর্তা হযরত আবু মূসা আশআরী (রা)-কে এই মর্মে পত্র লিখিলেন ঃ অতঃপর জানাইতেছি, যে গভর্নরের শাসনে প্রজাগণ নেককার হয়, তিনি বড়ই সৌভাগ্যবান। আর যে গভর্নরের শাসনে থাকিয়া প্রজাগণ দুষ্ট ও অসাধু হয়, সে বড়ই হতভাগ্য। সাবধান, আনন্দে আত্মহারা হইবে না যে, তোমার অধীনস্থ কর্মচারীগণও তদ্রূপ ন্যায়বিচার ও সাধুতার সহিত প্রজাপালন করিবে। তাহা হইলে তুমি এমন চতুষ্পদ জন্তুতুল্য হইবে যে ঘাস দেখিলেই খুব খাইতে আরম্ভ করে; ফলে ইহা মোটা-তাজা হইয়া উঠে এবং এই মোটা-তাজা হওয়াই ইহার ধ্বংসের কারণ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ পশু মোটা-তাজা হইলেই ইহাকে যবেহ্ করিয়া লোকে খাইয়া ফেলে।

তাওরীত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, বাদশাহের কর্মচারী দ্বারা অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া বাদশাহ্ নীরব থাকিলে স্বয়ং বাদশাহই যেন এই অত্যাচার করিল। এইরূপ অত্যাচারের জন্য বাদশাহ ধৃত হইবে।

যে ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের ধর্ম ও চিরস্থায়ী পরকাল বিনষ্ট করে, তাহার ন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্বোধ আর কেহই নাই-এই কথা শাসনকর্তার জানিয়া রাখা আবশ্যক। সকল কর্মচারী ও চাকর-নওকর দুনিয়া অর্জনের জন্য চাকুরী করিয়া থাকে এবং অত্যাচারকে তাহারা রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট সুন্দররূপে সাজাইয়া দেখায়। ফলে তাহারা তাঁহাকে দোযখের দিকে ধাবিত করে এবং তাহাদের মতলব উদ্ধার করিয়া লয়। যে ব্যক্তি কয়েকটি মুদ্রা অর্জনের জন্য তোমার ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করে তাহার অপেক্ষা বড় শত্রু তোমার আর কে হইতে পারে ?

মোটকথা, যে শাসনকর্তা স্বীয় কর্মচারী, চাকর-নওকর, স্ত্রী, সন্তান -সন্ততি ও ভৃত্যদিগকে সুবিধা ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারেন না তিনি কখনই স্বীয় প্রজাবৃন্দের প্রতিও সুবিচার করিতে পারেন না। যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে নিজ দেহরাজ্যের সুবিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখেন কেবল তিনিই সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। দেহরাজ্যের সুশাসন প্রতিষ্ঠার অর্থ হইল অত্যাচার, ক্রোধ ও কুপ্রবৃত্তিকে বিবেক-বুদ্ধির উপর প্রাধান্য না দেওয়া। যাহাতে বিবেক-বুদ্ধি ধর্মের বশীভূত হইয়া পড়ে এবং বুদ্ধি ও ধর্মকে রিপুসমূহের বশীভূত না করা। অধিকাংশ লোক বুদ্ধিকে ক্রোধ ও কুপ্রবৃত্তির গোলাম করিয়া রাখে। এমন কি তাহারা ক্রোধ ও কুপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাহানা অবতারণা করিয়া বলে, ইহাই বিবেক-বুদ্ধির নির্দেশ। বস্তুত ঃ ইহা কখনও বুদ্ধির নির্দেশ নহে। কারণ, বুদ্ধি ফেরেশতার উপকরণের উৎস এবং আল্লাহ্ তা'আলার সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। অপরপক্ষে কুপ্রবৃত্তি ও ক্রোধ শয়তানের সেনাবাহিনীর অন্তর্গত। অতএব, নাউ'যুবিল্লাহ্, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সৈন্যকে শয়তানের সৈন্যের হস্তে বন্দী করিয়া রাখিবে সে অন্যের প্রতি কি সুবিচার

করিবে ? সুবিচাররূপ সূর্য প্রথমতঃ মানুষের অন্তরাকাশে উদিত হয়। তৎপর ইহার আলো স্বীয় পরিবারবর্গ ও বিশেষ লোকদের উপর পতিত হয়। অতঃপর উহার কিরণ প্রজাবৃন্দের উপর পতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সূর্য ব্যতীত আলোক রশ্মির প্রত্যাশা করে, সে অসম্ভব আশা করিয়া থাকে।

পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি হইতে সুবিচার উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাবতীয় বিষয় বাস্তবে যে অবস্থায় বিদ্যমান আছে, উহাদিগকে ঠিক তদ্রূপই দেখা, উহাদের গূঢ় তত্ত্ব ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা এবং বাহ্য চাকচিক্যে বিমোহিত না হওয়াই বিবেক-বুদ্ধির পূর্ণতা প্রাপ্তির নিদর্শন। মানুষ দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই সুবিচার হইতে বিরত থাকে। সুতরাং ভাবিয়া দেখা উচিত, সে দুনিয়া হইতে কি পাইতে চায়। যদি দেখা যায় যে, উত্তম খাদ্য ভোজন করাই তাহার উদ্দেশ্য, তবে বুঝিবে সে মানুষের আকৃতিতে চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ। কারণ, কেবল আহারের লোভে মত্ত থাকা চতুষ্পদ জন্তুর কার্য। আর কেহ যদি উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের নিমিত্তে সুবিচার হইতে বিরত থাকিয়া অসুদপায় অবলম্বন করে, তবে বুঝিবে সে পুরুষের আকৃতিতে একজন নারী। কারণ, সাজসজ্জা ও সুন্দর বেশ–ভূষা লইয়া ব্যস্ত থাকা নারীদের কাজ। শত্রুর প্রতি স্বীয় ক্রোধ চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে কেহ অন্যায় ও অবিচার করিলে বুঝিবে, সে মানুষের আকৃতিতে একটি হিংস্র জন্তু। কারণ, ক্রোধের বশীভূত হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করা হিংস্র জন্তুর কাজ। লোকে তাহার সেবা করিবে এই আশায় পক্ষপাতিত্ব করিয়া সুবিচার না করিলে বুঝিবে সে বুদ্ধিমানের বেশে একজন নিতান্ত নির্বোধ। কারণ, বুদ্ধিমান হইলে সে বুঝিত যে, সমস্ত সেবাকারী উদরপূর্তি, কুপ্রবৃত্তি ও কামভাব চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই অপরের গোলামি করিয়া থাকে। কেননা, একদিনের মজুরি বন্ধ করিয়া দিলেই দেখিবে তাহারা তোমার ত্রিসীমানার মধ্যেও নাই। সুতরাং স্বীয় প্রবৃত্তির ফাঁদে আট্‌কা পড়িয়াই তাহারা পরের সেবা ও দাসত্ব করিয়া থাকে এবং তাহারা যে পরের দাসত্ব করিতেছে দেখিতে পাও, ইহা প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নিজেদের প্রবৃত্তির দাসত্ব। ইহার প্রমাণ এই যে, তাহারা যদি লোক মুখেও শুনিতে পায় যে, শাসন-ক্ষমতা অপর কাহারও হস্তে চলিয়া যাইতেছে, তবে তাহারা তোমার প্রতি বিমুখ হইয়া তৎক্ষণাৎ ভাবী শাসনকর্তার দ্বারে ধর্না দিয়া তাহার নৈকট্যলাভের চেষ্টা করিতে থাকিবে এবং যেখানে ধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে সেখানেই গোলামি ও সেবা করিবে। অতএব প্রকৃতপক্ষে ইহা সেবা করা নহে, সেবার প্রহসন মাত্র। সুতরাং যে ব্যক্তি যাবতীয় বিষয়ের প্রাণ ও গূঢ় তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করে, সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান। যাবতীয় বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা বুঝে না, তাহার বুদ্ধি নাই এবং যাহার বুদ্ধি নাই সে ন্যায়বিচারক হইতে পারে না, ফলে তাহার স্থান হয় দোযখে। এই জন্যই বুদ্ধি সর্ববিধ সৌভাগ্যের শীর্ষস্থানীয়।

দশম নিয়ম ঃ অহংকার যেন শাসনকর্তার উপর প্রাধান্যলাভ না করে। কারণ, অহংকারের দরুণই ক্রোধ প্রাধান্যলাভ করে এবং মানুষ প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয় ও তাহাকে বিপথে লইয়া যায়। ক্রোধের আপদসমূহ ও উহার প্রতিকারের উপায় বিনাশন খণ্ডে ক্রোধ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। শাসনকর্তার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হইলে সর্ববিধ কার্যে ক্ষমা করিবার আগ্রহ জন্মাইতে চেষ্টা করা তাহার কর্তব্য। করুণা ও ধৈর্যকে নিজের অভ্যাসগত পেশা করিয়া লওয়া এবং এইরূপ উপলব্ধি করা আবশ্যক যে, আমি যদি করুণা ও ধৈর্যকে স্বীয় অভ্যাসগত পেশা করিয়া লইতে পারি তবে আমি আম্বিয়া (আ), সাহাবা (রা) এবং ওলি (র) গণের ন্যায় হইতে পারিব। ক্রোধের বশীভূত হইয়া কার্য করিতে থাকিলে হিংস্র জন্তু ও চতুষ্পদ পশুতুল্য তুর্কী, গোঁয়ার পাহলোয়ান ও নির্বোধ লোকদের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িব।

কথিত আছে খলীফা আবু জাফর এক অপরাধীকে হত্যার আদেশ দিলেন। হযরত মুবারক ইব্‌ন ফুযালা (র) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর একখানা হাদীস শ্রবণ কর। খলীফা নিবেদন করিলেন ঃ বর্ণনা করুন। হযরত মুবারক (র) বলিলেন ঃ হযরত হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামত দিবস যখন সকলকে এক ময়দানে সমবেত করা হইবে তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, যাহার সাহস হয় আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। যে ব্যক্তি কাহারও অপরাধ ক্ষমা করিয়াছে তাহাকে ব্যতীত অপর কেহই দণ্ডায়মান হইবে না। ইহা শুনিয়া খলীফা বলিলেন ঃ এই অপরাধীকে ছড়িয়া দাও। আমি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলাম।

শাসনকর্তাগণের সম্মুখে কেহ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিলেই অধিকাংশ সময় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন; এমন কি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতেও উদ্যত হন। এই সময় হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর প্রতি হযরত ঈসা (আ)-এর উপদেশ তাঁহাদের স্মরণ করা উচিত। তিনি হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে বলিয়াছিলেন ঃ কেহ তোমাকে কিছু বলিলে তাহা যদি সত্য হয় তবে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তাহা মিথ্যা হইলে আরও অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কারণ বিনাপরিশ্রমে তোমার আমলনামায় একটি নেকী বৃদ্ধি পাইল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলিল তাহার ইবাদত হইতে প্রাপ্ত নেকী ফেরেশতা তোমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সমীপে লোকে বলিল ঃ অমুক ব্যক্তি খুব শক্তিশালী। হুযূর (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ লোকটি কেমন ? তাহারা নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে ব্যক্তি যাহার সহিতই কুস্তি লড়ে তাহাকেই পরাস্ত করে এবং সকলের সহিতই কুস্তিতে বিজয়ী হয়। হুযূর (সা)

বলিলেন ঃ সেই ব্যক্তিই শক্তিশালী ও বাহাদুর যে ব্যক্তি স্বীয় ক্রোধকে পরাস্ত করে; যে ব্যক্তি অপরকে পরাস্ত করে সে বাহাদুর নহে। হুযূর (সা) বলেন যে, তিনটি বিষয় আয়ত্তে আনিতে পারিলে মানুষের ঈমান পূর্ণতা লাভ করে ঃ (১) ক্রোধের সময় অন্যায় কার্যের ইচ্ছা না করা, (২) আনন্দের সময় কাহারও হক ভুলিয়া না যাওয়া এবং (৩) ক্ষমতা হাতে পাইলে নিজের প্রাপ্য হক অপেক্ষা অধিক গ্রহণ না করা।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ ক্রোধের সময়ে কাহাকেও না দেখা পর্যন্ত তাহার সৎস্বভাবের উপর বিশ্বাস করিও না এবং লোভের সময়ে যাচাই না করা পর্যন্ত কাহারও ধার্মিকতার উপর আস্থা স্থাপন করিও না। হযরত আলী ইব্‌ন হযরত হুসায়ন (রা) একদা মসজিদে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। পরিচারকগণ তাহাকে প্রহার করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগকে বারণ করিয়া বলিলেন ঃ প্রিয় ভ্রাতঃ আমার যে দোষ তোমার অজ্ঞাত রহিয়াছে তাহা তুমি যাহা প্রকাশ করিতেছ তদপেক্ষা অধিক। আচ্ছা, তোমার এমন কোন অভাব আছে কি যাহা আমি পূরণ করিতে পারি ? ইহা শুনিয়া লোকটি অত্যন্ত লজ্জিত হইল। তিনি স্বীয় পরিহিত বস্ত্র খুলিয়া লোকটিকে উপহার দিলেন এবং তাহাকে সহস্র দিরহাম দান করিবার জন্য স্বীয় পরিচারককে নির্দেশ দিলেন। লোকটি এই কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এই মহাত্মা বাস্তবিকই মহান রাসূল (সা)-এর উপযুক্ত বংশধর। এই মহাপুরুষের সম্বন্ধেই আরও কয়েকটি কাহিনী বর্ণিত আছে। একদা তিনি স্বীয় পরিচারককে দুইবার আহ্বান করিলেন। কিন্তু সে উত্তর দিল না। তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি শুনিতে পাও না ? সে বলিল ঃ আমি শুনিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ তবে উত্তর দিলে না কেন ? সে উত্তর করিল ঃ আপনার সৎস্বভাবের দরুন আমি নির্ভয় ছিলাম যে, আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন না। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি যে, আমার পরিচারক আমা হইতে নির্ভয় রহিয়াছে। এই মহাপুরুষের অপর এক গোলাম ছিল। একদিন সে তাঁহার ছাগলের পা ভাঙ্গিয়া দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কেমন করিয়া তুমি এইরূপ কাজ করিলে ? সে বলিল ঃ আপনাকে রাগান্বিত করিবার জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াই ইহা করিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ যে শয়তান তোমাকে এইরূপ কুমন্ত্রণা দিয়াছে আমি এখন তাহাকেই রাগান্বিত করিতেছি। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গোলামটিকে আযাদ করিয়া দিলেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁহাকে গালি দিল। তিনি তাহাকে বলিলেন ঃ হে যুবক! আমার ও দোযখের মধ্যে এই ঘাটিটিই রহিয়াছে। আমি যদি এই ঘাটি অতিক্রম করিতে পারি তবে যাহা কিছু তুমি বলিলে তজ্জন্য আমি আদৌ পরওয়া করি না। আর যদি অতিক্রম করিতে না পারি তবে তুমি যাহা বলিলে তদপেক্ষাও আমি নিকৃষ্টতর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এমন লোকও আছে যে সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার গুণে সারা বৎসর রোযা রাখা ও সারারাত্র দণ্ডায়মান হইয়া নামায পড়ার মর্যাদা লাভ করে। আর এমন লোকও আছে যাহাদের নাম উৎপীড়কদের তালিকাভুক্ত হইয়া থাকে, অথচ নিজ পরিবারবর্গ ব্যতীত অপর কাহারও উপর তাহাদের শাসন-ক্ষমতা ছিল না। হুযূর (সা) বলেন ঃ দোযখের একটি দরজা আছে; যে ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী ক্রোধ করে, সে ব্যতীত অপর কেহই এই দরজা দিয়া দোযখে প্রবেশ করিবে না।

বর্ণিত আছে যে, শয়তান হযরত মূসা (আ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল ঃ আমি আপনাকে তিনটি বিষয় শিক্ষা দিব। ইহার বিনিময়ে আপনি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিবেন। হযরত মূসা (আ) বলিলেন ঃ এই তিনটি বিষয় কি ? শয়তান বলিল ঃ (১) উষ্ণ স্বভাব ও ক্রোধ বর্জন করুন। কারণ, উষ্ণ ও হালকা স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এইরূপে খেলা করিয়া থাকি যেমন বালকেরা বল লইয়া খেলা করিয়া থাকে। (২) স্ত্রীলোক হইতে দূরে থাকুন। কারণ, মানুষের জন্য আমি যত ফাঁদ পাতিয়াছি তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য কোন ফাঁদের উপরই আমার আস্থা নাই। (৩) কৃপণতা হইতে আত্মরক্ষা করুন। কারণ, কৃপণের ইহ-পরকাল উভয় আমি ধ্বংস করিয়া ফেলি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)–বলেন ঃ যে ব্যক্তি অপরের প্রতি ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অন্তরকে শান্তি ও ঈমান দ্বারা ভরপুর করিয়া দেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট হীনতা প্রকাশার্থে আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিধান করে না, আল্লাহ্ তাহাকে মর্যাদার পোশাকে অলংকৃত করিয়া থাকেন। হুযূর (সা) বলেন, যে ব্যক্তি (অন্যের উপর) ক্রুদ্ধ হয় এবং নিজের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ ভুলিয়া যায়, তাহার জন্য আফসোস। এক ব্যক্তি হুযূর (সা)-এর নিকট আবেদন করিল ঃ আমাকে এমন একটি কাজ শিখাইয়া দিন যদ্দ্বারা আমি বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারি। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ ক্রুদ্ধ হইও না। তাহা হইলে তোমার জন্য বেহেশত রহিয়াছে। সে ব্যক্তি আরও উপদেশ প্রার্থনা করিলে হুযূর (সা) বলিলেন ঃ কাহারও নিকট কিছু চাহিও না। তাহা হইলে তোমার জন্য বেহেশত। সে ব্যক্তি আরও উপদেশ প্রার্থনা করিলে হুযূর (সা) বলিলেন ঃ আসরের নামাযের পর সত্তরবার আস্তাগফিরুল্লাহ্ পড়িবে তবে করুণাময় আল্লাহ্ তোমার সত্তর বৎসরের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। সে ব্যক্তি বলিল ঃ আমার সত্তর বৎসরের গুনাহ নাই। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তোমার আম্মার গুনাহ মার্জিত হইবে। সে ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ আমার আম্মারও এত গুনাহ নাই। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তোমার আব্বার গুনাহ্ মার্জিত হইবে। সে ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ আমার আব্বারও এত গুনাহ্ নাই। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তোমার মুসলমান ভাইগণের গুণাহ আল্লাহ মার্জনা করিবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু ধন বিতরণ করিতেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল ঃ এই বিতরণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে হইতেছে না অর্থাৎ ইহাতে ন্যায়বিচার রক্ষিত হইতেছে না। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা) লোকটির এই উক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র গোচরীভূত করিলে তিনি রাগান্বিত হইলেন এবং তাঁহার পবিত্র বদন মণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল, তথাপি তিনি ইহার অধিক আর কিছুই বলিলেন না ঃ আমার ভাই (হযরত) মূসা (আ) -এর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক। কারণ, লোকে তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি কষ্ট দিয়াছিল এবং তিনি উহা অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন।

বিচারক ও শাসনকর্তাগণের উপদেশ গ্রহণের জন্য উপরিউক্ত উপাখ্যানসমূহ এবং হাদীস-বাণীগুলিই যথেষ্ট। কারণ, তাঁহাদের অন্তরের আসল ঈমান বিদ্যমান থাকিলে এইগুলিই তাঁহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। আর যদি দেখা যায় যে, এই সমস্ত উপাখ্যান ও হাদীস-বাণী তাঁহাদের অন্তরে কোনই প্রভাব বিস্তার করে না তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের হৃদয়ে ঈমানের লেশমাত্রও নাই: কেবল ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিই অবশিষ্ট আছে। ঈমানের বিষয়গুলির মৌখিক স্বীকৃতি এক কথা এবং অন্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ঈমান ভিন্ন জিনিস। যে সকল শাসক ও কর্মচারী প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র মুদ্রা হারাম উপায়ে আদায় করতঃ অপরাপর লোককে প্রদান করে, আবার এ সমস্ত অর্থের দায়িত্ব আদায়কারীদের স্কন্ধেই থাকিয়া যায় এবং কিয়ামত-দিবস ইহার হিসাব-নিকাশ তাহাদের নিকটই তলব করা হইবে, আমি বুঝিতে পারি না যে, তাহাদের অন্তরে যথার্থ ঈমান কিরূপে থাকিতে পারে। অথচ এই সমস্ত অর্থ দ্বারা অপর লোকেরাই লাভবান হইয়াছে। কেবল সংসারাসক্ত অবিবেচক বেঈমান লোকেরাই এইরূপ কার্য করিতে পারে।

والله اعلم بالصواب وعنده ام الكتاب-